ছোটদের
ভালো ভালো
গল্প
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীপ্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ঝুলন পূর্ণিমা। ১৩৭০

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ১২

প্রচ্ছদশিল্পী
চারু খান

মুদ্রক
কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলকাতা ৬

দাম
দুই টাকা

॥ সূচী ॥

বন্ধু ৯ । গরিব ১৮ । ওষুধ ২৭ । ওভার কোট ৩৪ ।
চোর ৪২ । আয়ু ৫২ । অলিখিত দলিল ৬২ । বাড়ি ৭১

ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

নীচে প্রায় সদর দরজার কাছেই ছোট একটা ঘরে বিনোদ শোয় এবং একা শোয়। নীচেটা একদম ফাঁকা, তবু কিছুতে বিনোদের ভয় নেই। সেদিন তাদের পাশের বাড়ির ছাদে যে একটা জলজ্যান্ত খুন হলো—এত হৈ-চৈ, এত কান্নাকাটি এবং তারই ঘরের পাশের গলি দিয়ে যে সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটা মোটরে করে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলো—এতেও বিনোদের ঘুম ভাঙেনি। মা তাকে জাগাতে এলে বলেছিলো, 'পায়ের দিকের জানলাটা খুলে দাও, যা গরম আজ!'

মা বললেন, 'না, তুই ওপরে চল্, আমার ঘরে শুবি।'

বিনোদ পাশ ফিরে বললে, 'কিসের ভয় তোমার! এতো গোলমালে সেই খুনিটা তো আর ঘাপটি মেরে বসে থাকেনি, কখন দিব্যি সরে পড়েছে। সে আবার এখানে ফিরে আসবে নাকি?'

মা অবুঝের মতো বললেন, 'না, ওপরে চল্। তুই এ ঘরে একা থাকিস বলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। চ্যাচালেও শুনতে পাবো না।'

'চ্যাচানি তোমাদের শুনতে দেবো নাকি ভেবেছো? যদি ব্যাটা আসে, টুঁটি টিপে তার দম বন্ধ করে দেবো না?'

দিদি বললেন, 'কিন্তু যাকে মেরেছে, সে যদি এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায়!'

বিনোদ হেসে বললে, 'তার মুখটা ভালো করে দেখবার জন্যেই তো পায়ের দিকের জানলাটা খুলে রাখতে বললাম। মুখ যদি বাড়ায়-ই তবে নেহাৎ না হয় দুটো গল্পই করা যাবে।'

কিছুতেই বিনোদের ভয় নেই। তার স্কুলের বন্ধুরা কতো ষড়যন্ত্র করে তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, রাত্রিবেলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মশারির দড়ি নাড়ে, ঢিল ছোঁড়ে, বিকট স্বরে হরিবোল দেয়, চাকরের হাতে পয়সা গুঁজে দরজা খুলিয়ে ওর তক্তাপোষের তলায়

গিয়ে লুকোয়—গোঁ গোঁ করে, ঠুক-ঠাক করে, দুম-দাম করে, কিন্তু বিনোদের ঘুম ভাঙাতে পারে না। শেষে আস্র্লার উৎপাতে ওরাই বেরিয়ে আসতে পথ পায় না! গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলে, 'কিছুতেই তোকে ভয় দেখাতে পারলুম না, বিনু!'

বিনোদ হেসে বলে, 'দুবেলা যে নিয়মিত ডন-বৈঠক করে, তার আবার ভয় কি? খেয়ে হজম করি, আর গভীর করে ঘুমোই—'

শেষকালে অভয়কে বলতে হয়, 'একা একা বাড়ি ফিরে যেতে আমারই এখন ভয় হচ্ছে।'

বিছানা থেকে ঝট করে লাফিয়ে উঠে বিনোদ বলে, 'চল্, তোকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

রাত তখন প্রায় বারোটা। রাস্তাঘাট নিঝুম। বিনোদ তার বিছানায় অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। কে যেন গলা খাঁকরে ডাকলে, 'বিনু, বিনু!'

সাধারণত এত সহজে বিনোদের ঘুম ভাঙেনা, কিন্তু সেই অস্ফুট কণ্ঠের ডাক শুনে চট্ করে তার ঘুম ভেঙে গেলো। এমন অনেক কালা আছে, চেঁচিয়ে কথা বল্লে তার এক বর্ণও যারা শুনতে পায়না, কিন্তু চলন্ত ট্রেনের শব্দের মধ্যেও আস্তে তাদের একটু নিন্দে করলে তেড়ে উঠে বলে, 'কি বললে? ভাবো, আমি শুনতে পাইনি?'—বিনোদেরও আজ সেই দশা। চুপি চুপি কেউ তাকে ভয় দেখাতে এসেছে বুঝি! কিন্তু সব সময়েই সে সাবধানী। জোরে ডাকলে সে তেমনি ঘুমোয় বটে, কিন্তু আসতে ডাকলে জেগে উঠতে জানে।

পাছে লোকটা সাড়া পেয়ে পালায়, বিনোদ তাই কথা না বলে হাতে একটা লকলকে বেত নিয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে দিলে।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে অভয় হাসছে।

বিনোদ তো অবাক ! বললে, 'তুই এ সময় ? এতো রাতে ? কি দরকার ?'

অভয় ভিতরে ঢুকে বললে, 'সাড়ে ন'টার শোতে বায়োস্কোপ-এ গিয়েছিলাম। এই ফিরছি।'

—'বাড়ি যাসনি ?'

অভয় চাপা গলায় বললে, 'বাড়ি আর ফিরবো না।'

—'কেন, কি হলো ?'

—'বাবা-মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

বিনোদ বিস্মিত হয়ে বললে, 'তাড়িয়ে দিয়েছেন তোকে ? কেন ? কি অপরাধ ?'

—'অপরাধ আবার কি ? ও-বাড়িতে আমার আর পোষাবে না।' তারপর ঘরের চৌকাঠের দিকে পা বাড়িয়ে বললে, 'চল্, ভেতরে বসি।' ঘরের এক কোণে ক্যানভাসের ইজিচেয়ারটায় বসে অভয় বললে, 'তোর এখানে আজ আমি শোবো। দিবি তো শুতে ?'

বিনোদ আলো জ্বালালো। বললে, 'স্বচ্ছন্দে !'

আলোতে বিনোদ দেখলে, অভয় অত্যন্ত অদ্ভুত সেজেছে। গায়ে গরদের পাঞ্জাবীর ওপরে দামী শাল, পরনে সিল্কের ধুতি, পায়ে জরির জুতো, হাতের কব্জীতে সোনার রিস্টওয়াচ বাঁধা। সারা গায়ে এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে। পরিপাটি করে টেরি বাগানো। ডানহাতের আঙুলে হীরের একটা আঙটি।

বিনোদ বললে, 'এতো সেজেগুজে বেরিয়েছিস! চেহারা দেখে তো ত্যাজ্যপুত্তুর হয়েছিস বলে মনে হয় না।'

অভয় হেসে বললে, 'বাবা-মা বাড়ি থেকে বার করে দিলেন বটে, কিন্তু যতো কিছু আমার জিনিস ছিলো, সব সঙ্গে দিয়ে বললেন, "এই নাও তোমার জিনিস পত্তর, আর এ মুখো হয়োনা বাছাধন। যেখানে খুশি বেরিয়ে পড়ো"। সেই যে জাপানী বাক্সটায় রোজ দু-চার

আনা করে জমাতাম বিন্থ, সেই বাক্স ভেঙে সব খুচরো সিকি-আধুলি আমার পকেটে দিয়ে দিয়েছেন। বললেন, যেখানকার খুশি টিকিট কেটে ভেসে পড়ো, তোমার ঐ কালোমুখ আর দেখতে চাইনে।'

বিনোদ বিছানায় বসে অভয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। পরে বললে, 'কিন্তু কি তুই করেছিলি, শুনি?'

—'বলছি।' অভয় বললে, 'তোর ম্যাপের বইটা দেতো।'

—'কি করবি?'

—'একটা জায়গা খুঁজে বের করবো। খুব দূরে—যেখানে মানুষ সহজে যেতে চায়না। ধর, গ্রীনল্যাণ্ড—বছরে ছ'টা মাস সেখানে রাত, কঠিন বরফের দেশ—পড়িস নি ভূগোলে?'

বিনোদ হেসে উঠলো। বললে, 'কিন্তু পকেটে মাত্র তো কয়েকটা টাকার খুচরো দেখতে পাচ্ছি। ঐ নিয়ে তুই গ্রীনল্যাণ্ডে যাবি!'

টেবিলের ওপর 'অ্যাটলাসটা' পড়েছিলো, সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে অভয় পাতা ওল্টাতে লাগলো। বললে, 'এমন জায়গায় যাবো, যেখানে যেতে ভাড়া লাগে না।'

বিনোদ হেসে বললে, 'আপাতত দেখছি সে তো আমার শোবার ঘর। তুই পাগলামি করিস নে। চল্, তোকে বাড়ি রেখে আসি। বাবা বকে থাকেন, এখন নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

অভয় বললে, 'খুঁজুন গে! কিন্তু একবার যখন বেরিয়েছি, আর আমি ফিরছি না। জাহাজে করে আমি স্পেনে যাবো, সেখান থেকে কলম্বাসের মতো নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করতে বেরুবো। জাহাজ না পাই, সঙ্গী না জোটে, তবু আমি পেছপা হবো না। নে, আলোটা নেবা—আজ রাতটা তো এখানে ঘুমোই!'

বিনোদ বললে, 'বিছানায় উঠে আয়। দু'জনে খুব ধরবে।'

অভয় বললে, 'না, না, আমি চিৎ হয়ে আরাম করে শুতে পারবো না, আমার মেরুদণ্ডে খুব চোট লেগেছে। এই বেশ, ঘুমোতে

পারবো এখানে। একটা বালিশ এগিয়ে দে দেখি।' বলে সে নিজেই আলো নিবিয়ে একটা বালিশ টেনে পিঠের তলায় রেখে আবার বললে, 'নে, তুই এখন শুয়ে পড়। ঢের রাত হয়েছে। কাল ভোরে উঠে চা খেতে খেতে না হয় কর্তব্য ঠিক করা যাবে।'

বিনোদ বললে, 'এমনি ঘুম আসবে ? হতভাগা, উঠে আয়।'

অন্ধকারে অভয় খিল খিল করে হেসে উঠলো, বললে, 'পাগল ! ঘুম আসবে না কি ! ইস্কুলে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে পর্যন্ত ঘুমুই, আর এ তো দিব্যি মোলায়েম একটি চেয়ার। কলম্বাসের মতো দেশজয়ে যে বেরুবে, তাকে খালি গায়ে শীতের রাতে শুকনো কাঠের ওপর শুলেও বেমানান দেখাবে না। থাক, তোকে আর বকাবো না, ঘুমো।'

বিনোদের একটুতেই ঘুম আসে, কিন্তু অনেকক্ষণ চোখ বুজে থেকেও কিছুতেই আজ তার ঘুম এলো না। অভয়ের সঙ্গেই আরো খানিকক্ষণ গল্প করা যাক। চোখ না মেলেই ডাকলে, 'অভয় !'

অভয়ের কোন সাড়া নেই। মেরুদণ্ডে চোট পেয়েও ঘুমের তার একবিন্দু ব্যাঘাত হয় নি।

আবার ডাকলে, 'অভয় !'

সেই অন্ধকার কালো রাত্রি আজ স্থূল নিঃশব্দতা !

বিনোদ লাফিয়ে উঠে বসলো। ঘরে কেউ নেই। ম্যাপের খাতাটা মেঝের ওপর ওলটানো, চেয়ারের ওপর বালিশটা কুঁচকে পড়ে আছে। দরজাটা খোলা। সে ঘর ছেড়ে সদর দরজার কাছে এলো। অভয় আবার কখন্ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

দুষ্টু ছেলে, তাকে ভয় দেখাবার নতুন ফন্দি করেছে বুঝি ! কিন্তু বিনোদ দমবার পাত্র নয়। গরম কোটটা গায়ে দিয়ে সে রাস্তায় নামলো। কোথাও একটা জনপ্রাণী নেই, নিজের দ্রুত নিঃশ্বাস ছাড়া একটা সামান্য শব্দও সে কোথাও শুনতে পাচ্ছে না।

বিনোদ আবার ডাকলে, 'অভয়।'

মুহূর্ত মধ্যে তার খুব কাছে খিল্ খিল্ করে কে খুব জোরে হেসে উঠলো এবং সেই খণ্ড-খণ্ড হাসির ঢেউ মিলিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলো অভয়।

বিনোদ বললে, 'কোথায় গেছলি ?'

—'বা, এইখানে তোর পাশেই তো দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘরে ভীষণ গরম—অতো গরমে কখনো ঘুম আসে ?'

—'গরম কিরে পাগলা ? এই কনকনে শীতের রাতে তোর গরম লাগছে, বলিস কি !'

অভয় হেসে বললে, 'গরম বলে গরম ! চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে। টেঁকা দায়। চল্, রাস্তায় একটু হাঁটি।'

বিনোদ ভাবলে মন্দ নয়, বেড়াতে বেড়াতে গল্পের ফাঁকে অভয়কে তাদের বাড়ির দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে পূর্ণবাবুকে ডেকে তাঁর ছেলেকে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেবে।

বিনোদ বললে, 'চল, কিন্তু সদর দরজাটা যে খোলা থাকবে। দাঁড়া, ভজুয়াকে বলে আসি বন্ধ করে দিতে। থাকগে, ডাকতে গেলেই আবার মা টের পাবে। ভেজিয়েই আসি দরজাটা। খানিক বাদেই তো ফিরে আসছি, কি বল ?'

অভয় বললে, 'তোর ভাবনা কি ! তোকে তো আর বাপ্-মা তাড়িয়ে দেয়নি। আমারই জন্যে না হয় দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।' দু'বন্ধু বড়ো রাস্তায় এসে পড়লো। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বিনোদ হঠাৎ একটু ভয় পেয়ে বললে, 'এবার ফের্।'

অভয় হেসে বললে, 'কোথায় ? এই তো বেশ যাচ্ছি।'

খানিক দূরে কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে দেখা গেলো। একজনকে বিনোদের মনে হলো খানিকটা যেন পূর্ণবাবুর মতো দেখতে। লোকজন নিয়ে ছেলের খোঁজে বেরিয়েছেন নিশ্চয় ! অভয়কে এবার স্বচ্ছন্দে ধরিয়ে দেওয়া যাবে।

লোকগুলো না বেঁকে সামনে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বিনোদ ভরসা পেলো। অভয়কে বুঝতে না দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আরো একটু বেড়াই, আয়।'

অভয় বললে, 'কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। বাবা ঐ এসে পড়লেন। তোর কাছে আমি সেই সাত আনা পয়সা ধারতুম না—সেই যে, রেষ্টুরেণ্টে খাইয়েছিলি ? এই নে, চট্ করে'—বলে সে পকেট হাতড়ে কতকগুলো পয়সা বার করলে, বললে, 'গুনে নে, শীগ্‌গির। বাবা মেজদা, ন'কাকা, রাখালখুড়ো—সব এসে পড়লেন যে! দেরী নয়, শীগ্‌গির তুলে নে পয়সাগুলো, আহাম্মক'—বলে পয়সা-ভরা হাতমেলে অভয় কাঁপতে লাগলো। এখনি সে যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে।

বিনোদ এরই জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত ছিলো। গায়ের জোরে তার সঙ্গে তাদের স্কুলের ছাত্র দূরের কথা, মাস্টাররাই পেরে ওঠেন না। সে তাড়াতাড়ি অভয়কে দুই শক্ত হাতে জাপটে ধরে বললে, 'কিন্তু কোথায় তুই যাবি ? তোকে ধরিয়ে দেবো না আমি ?' কিন্তু কোথায় অভয় ? বিনোদ দু'হাত দিয়ে নিজের বুকটা জোরে চেপে ধরে নিজের সঙ্গে অকারণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

অভয় কোথাও নেই।

কখন টুপ করে সরে পড়েছে। নিশ্চয়ই পাশের গলি দিয়ে। এখনো ছুটলে তাকে ধরা যায়। দেখতে দেখতে পূর্ণবাবু দলবল নিয়ে কাছে এসে পড়লেন। বিনোদ তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। পূর্ণবাবুকে দেখে তার বুকে বল এলো ; সে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আপনারা অভয়কে খুঁজতে বেরিয়েছেন তো ?'

পূর্ণবাবু তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

বিনোদ বললে, 'সে এই গলি দিয়ে পালিয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে। খুব জোরে ছুটলে এখনো তাকে ধরতে পারবেন। আমি তাকে জাপটে ধরেও রাখতে পারলুম না। খুব যুযুৎসুর প্যাঁচ

শিখেছে যা হোক! আপনারা কেউ ও-দিক দিয়ে ঘুরে যান, আমি এদিকে যাচ্ছি। ঐখানে কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়।'

পূর্ণবাবু হঠাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে শিশুর মত ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে বললেন, 'কই তোমার অভয়? ঐ দেখো।' বলে চারজনের কাঁধে উত্তোলিত একটা খাটিয়ার পানে ইঙ্গিত করলেন।

বিনোদ কিছু বুঝতে পারলে না। খাটিয়াটার ওপরে লম্বালম্বি কি একটা জিনিস আগাগোড়া ঢাকা।

একজন বললে, 'বিকেলে মোটর চাপা পড়ে সে মারা গেছে'!

বিনোদ সমস্ত গায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'মিথ্যে কথা। সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে, দু'জনে বেড়াতে বেরোলুম, —কেন আমায় মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছেন। অভয় আমাকে বললে, আপনারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে স্পেনে যাচ্ছে; সেখান থেকে জাহাজে করে আমেরিকায়—কতো কথা বললে, আমাকে পয়সা দিতে চাইলে—গরদের পাঞ্জাবীর ওপরে মেরুণের শাল—আসুন না আমার সঙ্গে, এই গলিতে। তাকে ধরে না দিই তো কি বলেছি—'

পূর্ণবাবুরা এগোতে লাগলেন। বিনোদ হতভম্বের মতো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা সে স্পষ্ট করে এখনো বুঝতে পারছে না। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে নাকি? না তো! রসা রোড, রাস্তার এক পারে ইলেকট্রিক ও অন্য পারে গ্যাস জ্বলছে—লাঠি হাতে ঐ একটা কনষ্টেবল, দূরে ঐ পূর্ণবাবুদের দল চলেছে শ্মশানে। পূর্ণবাবু হেঁকে বললেন, 'তুমি এবার বাড়ি যাও, বিনু।'

বিনোদ তবু নড়ে না। ভয়ে সে জমে গেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, পূর্ণবাবুরা কালিঘাটের দিকে ঘুরে গেলেই পাশের গলি থেকে অভয় বেরিয়ে আসবে। অভয় আবার বেরিয়ে আসবে ভাবতে ভাবতে বিনোদ হঠাৎ আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

কিন্তু আবার তেমনি সেই খিল্ খিল্ হাসি। একেবারে তার

কাছে—রাস্তার ওপরে। কিন্তু অভয় কোথাও নেই। একটা ট্যাক্সী চলে যাচ্ছে মাত্র।

ট্যাক্সীটা বিনোদ দাঁড় করালো।

বাড়ী থেকে অনেক দূর সে চলে এসেছিলো, এখন পায়ে হেঁটে কিছুতেই যেতে পারবে না। পেছন থেকে অভয় এসে তার সঙ্গ নেবে, তার কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে চাইবে, সাত আনা সে ধেরো ছিলো, এখনো সে ভোলেনি।

ট্যাক্সী চেপে বিনোদ বললে, 'চালাও, এলেনবি রোড।'

কিন্তু কিছুদূর যেতেই মনে হলো ট্যাক্সীটার আগে আগে অভয়ও ছুটে চলেছে। কিছুতেই সে বিনোদকে ছেড়ে দেবে না। বিনোদ চেঁচিয়ে উঠলো, 'খুব জোরে চালাও, পাঁয়জী।'

শিখ ড্রাইভার গাড়ি খুব জোরে ছুটিয়েছে। অভয় ট্যাক্সীর সঙ্গে সমানে চলতে পারছে না। হাত তুলে স্পষ্ট সে বললে, 'আস্তে।'

কিন্তু ট্যাক্সী থামলো না, তার গায়ের ওপর হুড়মুড় করে পড়লো। বেচারা অভয় দলা পাকিয়ে চাকার তলায় চেপ্‌টে গেলো। বিনোদ চোখ বন্ধ করে কর্কশ গলায় চীৎকার করে উঠলো, গেলো, গেলো—বাঁধো গাড়ি, বাঁধো শীগ্‌গির বলছি।'

ড্রাইভার কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে বললে, 'ক্যা হুয়া ?'

বিনোদ ঝুঁকে পড়ে গাড়ির তলাটা দেখতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও এক বিন্দু রক্ত নেই। অভয় তাড়াতাড়ি উঠে খিল্ খিল্ করে হেসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'ভয় নেই, আমার কিছু হয়নি। খালি এই মেরুদণ্ডটায় সামান্য একটু চোট লেগেছে। খুব হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলি যা হোক। আচ্ছা, গুড নাইট।'

আর তাকে দেখা গেল না!

অতুল ম্যাট্রিক পাশ করার পর গাঁয়ের সবাই বললে, কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ে জাত-ধর্ম খুইয়ে লাভ কি ? তার চেয়ে—বামুন পুরুতের ছেলে, এখানেই যজমানগিরি করে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকো।'

অতুল কিন্তু শোনেনা, সে শহরে যাবেই লেখাপড়া করতে—মানুষ হতে। তার আশা, সে মাটির বাতি হয়ে ঘরের কোণে বসে টিম্‌টিম্ করে জ্বলবে না, সূর্যের মতো চতুর্দিকে আলো বিকীর্ণ করে দেবে।

মা কেঁদে বললেন, 'সেখানে দিন চলবে কি করে ?'

অতুল তার শক্ত বাহু দুটো দেখিয়ে বললে, 'যিনি দুই হাতে শক্তি দিয়েছেন তিনিই চালাবেন, মা।' বিদ্যাসাগরের জীবনী তো তোমার মুখেই শুনেছি। বিপদকে ডরাবো—আমি কি তোমার তেমন ছেলে ? বিপদকে যদি জয় করতে না পারি, তবে তো আমার কোনো শিক্ষাই হলো না।'

তাই একদিন অতুল মা'র পায়ের ধুলো নিয়ে চাদরের খুঁটে প্রসাদী শুকনো বেলপাতা বেঁধে হাসিমুখে বেরিয়ে পড়লো—বেণীর ফিতের মতো আঁকাবাঁকা গাঁয়ের পথে—নদীর ঘাটে ষ্টীমার ধরতে! মা উঠোনটুকু পার হয়ে এসে দরমার বেড়া ধরে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন—তাঁর দুটি অশ্রুভরা চোখ দুঃসাহসী ছেলের কথা ভেবে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—ভাদ্র মাসের নদীর ওপর সোনার বরণ রোদ এসে পড়লে তরল জল যেমন চিক্ চিক্ করে ওঠে, তেমনি।

কলকাতায় এসে অতুল বুঝতে পারলো, কলের জল ছাড়া খাবার তার আর কিছু নেই। ওর গাঁয়ের চেনা একটি লোক ছাতার বাঁট তৈরী করে, থাকে একটা নোংরা সরু গলিতে, তারই বাসায় অতুল এসে উঠলো।

মাটির ওপর মা'র নিজের হাতে সেলাই করা কাঁথাখানি পেতে শোয় আর যতক্ষণ ঘুম না আসে, গাঁয়ের সেই অফুরন্ত আকাশ আর মাঠের কথা ভাবে—মন সেখানে উড়ে যেতে চায়। তিনদিন এমনি করেই কাটলো, পরদিন চাকরির চেষ্টায় শহরটা প্রায় চষে এসে অতুল দেখলে তার জন্যে ভাত নেই।

জিজ্ঞাসা করতেই আশ্রয় দাতা সেই লোকটি খেঁকিয়ে উঠলো, 'আমি খাটবো আর বসে বসে তুমি গিলবে, এমন নিয়ম ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও বরদাস্ত করতো না। তুমি পথ দেখো।'

শাদা কথা সহজেই অমান্য করতে পারে ভেবে লোকটি দক্ষিণা-স্বরূপ অতুলের পায়ে ছাতার বাঁট দিয়ে একটা বাড়ি মারতেও ছাড়লো না। মায়ের হাতের নক্সা-করা কল্কা-কাটা কাঁথাখানি গায়ে জড়িয়ে অভুক্ত অতুল পথে বেরিয়ে পড়লো।

তোমরা যদি পারো একবার সেই পথের কল্পনা করো। প্রত্যেকটি পা ফেলার সঙ্গে সেই পথের আরম্ভ—কিন্তু যতই কেন না চলো তার শেষ নেই ; অতুল তবু দমবার ছেলে নয়। সামান্য একটা কাক পর্যন্ত আধ কলসী জলে পাথরের টুকরো ফেলে তলার জল ঠোঁটের কাছে এনে পিপাসা মিটিয়েছিলো। অতুল মোট বইবে। ঐ একটি ভদ্রলোক বাস থেকে নেমে একটা মুটেই খুঁজছেন হয়তো।

অতুল সামনে এগিয়ে গেলো, বললে, 'আমাকে দিন, বাক্সটা আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

অতুলের জামা কাপড় তখনো ফর্সা, পায়ে জুতো, মুখখানি কচি, কোমল—ভদ্রলোক বিশ্বাস করতে পারলেন না, ভাবলেন—ছেলেটা ঠাট্টা করছে বুঝি! তাই একটা ঝাঁকা-মুটে নিয়ে চললেন।

কলের জলই একমাত্র আহার্য অতুলের। থেকে থেকে তাতেই চুমুক দেয় আর পথ চলে। একদিন সকালবেলা অতুল চোখ চেয়ে দেখলে—পরিষ্কার বিছানায় সে শুয়ে আছে। জ্ঞান হতেই তার ভারি

লজ্জা হতে লাগলো। মনে পড়লো, কাল রাত্রে এঁদের রোয়াকে শুয়ে পড়ার পর ঘুম ভেঙে দেখতে পাচ্ছে কখন রোয়াকটা রাতারাতি তক্‌তকে নরম বিছানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গৃহস্বামীটি ভারী দয়ালু, অতুলের কথা শুনে তাকে এক কথায় টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন, কিন্তু শুধু শুধু হাত পেতে সে সাহায্য অতুল নেবে কেন? কিছুমাত্র যোগ্যতা না দেখিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেও সে করুণা চায়না। ঠিক হয়ে গেলো, গৃহস্বামীর ছোট ছেলে ভজু ক্লাস সেভেন্‌-এ পড়ে, অতুল বাড়ীতে তাকে পড়াবে। সেই সর্তে আগাম টাকা নিয়ে অতুল কলেজে ভর্তি হলো বটে, কিন্তু খুশি হতে পারলো না। কেন বলো তো? সম্পদেও সে খুশি হবে না, কারণ এ সম্পদের জন্যে দায়ী তার ভাগ্য—তার নিজের পুরুষকার নয়। বাপ-পিতামহ যাদের অনেক টাকা রেখে যায়, সে টাকা ভোগ করতে তৃপ্তি নেই; কেননা সেটা নিজে খেটে উপার্জন করা হয়নি বলে। ভদ্রলোক অতুলকে এ বাড়ীতেই থেকে যেতে বললেন, কিন্তু অতুল রাজী হলো না।

ভজুর বন্ধু যতীন। ইস্কুলে গিয়েই সে যতীনের হাত ধরে বললে, 'বাবা আমার জন্যে চমৎকার এক মাষ্টার রেখে দিয়েছেন, ভাই। কতো সুন্দর সুন্দর গল্প যে বললেন কি বলবো! জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌ কেৎলিতে গরম জল ফুটতে দেখে ইঞ্জিন বানিয়ে ফেললেন—জানিস; বল্‌তো, কোন্‌ কবি একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েও বই লিখেছেন? জানিস, বীঠোফেন্‌ কালা হয়ে গিয়েছিলো, তবুও বাজনায় তার কান ছিলো অদ্ভুত। বীঠোফেন্‌ বানান কর দিকিন।'

যতীন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো দুটি কারণে—প্রথমতঃ এতগুলি আজব খবর পেয়ে ভজু তাকে পিছিয়ে দিয়েছে; দ্বিতীয়তঃ ভজুর সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে তাকেও মাষ্টার রাখতে হবে—ভজু এসে যে রোজ রোজ চাল মারবে তাও হজম করতে পারবে না। পরদিন

খাবার মত নিয়ে এসে ভজুকে সে বললে, 'তোর মাষ্টারমশাইকে বলিস, আমাকেও তিনি পড়াবেন। ঠিকানাটা বলে দিস।'

যতীনদের বাড়ীতেও অতুল মাষ্টারি পেয়ে গেলো। দুটো কাজই সকালে সেরে নেয়—সন্ধ্যাটা হাতে রাখে নিজের পড়ার জন্যে। কাকে আগে পড়াবে এই নিয়ে ঝগড়া হতে হতে রফা হলো, সপ্তাহে তিনদিন আগের ঘণ্টায় ভজু, বাকি তিনদিন যতীন, রবিবার ছুটি।

যদি ভজু এসে শুধোয়, 'বানান করতো নিউমোনিয়া', যতীন ঠিক ঠিক উত্তর দেয়। যদি যতীন এসে জিজ্ঞেস করে, 'বলতো গ্যারি-বল্ডি কে' উত্তর দিতে ভজুর এক মুহূর্তও দেরী হয় না।

ভজু অতুলকে বলে, 'মাষ্টারমশাই, আমাকে এমন একটা খবর দিন, যা যতীনকে কক্‌খনো জানানো হবে না। ওকে জব্দ করতেই হবে! আচ্ছা, আকাশে কতো তারা আছে? কেউ গুনতে পারেনি? পেরেছে? কি নাম তার? কার্ল লিনিয়ার্স? বাড়ী কোথায় বললেন? সুইডেনে? দাঁড়ান, লিখে রাখি। এ খবরটা ওকে বলবেন না কিন্তু।'

তেমনি যতীন আবার বলে, 'একটা আন্‌কোরা খবর আমায় দিন, যা শুনে ভজু একেবারে আকাশ থেকে পড়বে। কলম্বাস যে আমেরিকা আবিষ্কার করেছে তা ও জানে, কিন্তু ক্লোরফর্ম কে বার করেছে, তা বার করা ওর সাধ্যি নয়, কি বললেন? জেম্‌স্ সিম্পসন্? নিজের নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেছিল? দাঁড়ান, লিখে রাখি। আসুক ও লড়তে। আর কি বললেন? মাইকেল ফ্যারাডে? কি বার করেছিলেন? বৈদ্যুতিক শক্তি? আজ কি মজাই যে হবে!'

ভজু আর যতীন দুজনেই বড়লোকের ছেলে, কিন্তু ওদের স্বভাবে তারতম্য ছিলো। ভজু সেয়ানা, দুষ্টু—যতীন একটু নিরীহ, বুনো।

অতুলের কাছ থেকে ভজু দেশ বিদেশের গল্প শুনতে চায়, ঘরের দরজা বন্ধ করে মাষ্টারমশাইকে চড়ুই পাখী ধরতে বলে।

বই মুড়ে রেখে বলে, 'চলুন, পার্কে গিয়ে সুতোয় মাঞ্জা দিই ; নতুন একটা লাটাই কিনেছি।'

যতীন দেয়ালে পিঠ পেতে বসে অতুলদের গাঁয়ের গল্প শোনে—সেই ষ্টিমার ঘাট, সকালবেলা কুয়াসা কেটে ষ্টিমার আসে, ফিরি-ওয়ালারা ষ্টিমারে উঠে গরম দুধ, পাতক্ষীর বেচে। ভিখিরীরা জলে নেমে আঁকশিতে ডালা বেঁধে দোতলার যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা চায়, ঢেউয়ের তালে তালে নৌকাগুলি দুলতে থাকে। মাচা বাঁধা মুদির দোকানের দাঁড়ে বসে ময়না কথা কয়, ষ্টীমার দেখতে কনে-বউরা এক হাত ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভজু বলে, 'বাবার এই ঘড়িটা ভেঙে ফেলেছি, মাষ্টারমশাই। একে আবার জোড়া দিয়ে আস্ত করে তুলবো। এই দেখুন, আবার টিক্‌টিক্ করছে! মরা ঘড়িকে আমি প্রাণ দিয়েছি!'

যতীনের এ বিষয়ে উৎসাহ নেই, সে বিকেলবেলায় ঘরে বসে রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকে—নদীর পাড়ে গাঁয়ের ছবি—মুদির দোকানে দাঁড়ে বসে ময়না জলের বাটিতে ঠোঁট ডুবিয়েছে। ষ্টীমারটা অবশ্য আঁকতে পারে না।

মাষ্টারমশায়ের জন্যে ক্রমেই ভজু আর যতীনের বন্ধুত্বে মন্দা পড়ে আসছে—অবশেষে তা একটা প্রবল ঝগড়ার আকারে দেখা দিলো। ব্যাপারটা কিন্তু মজার। ইস্কুলের প্রাইজ নেবার দিন ভজু ও যতীন দু'জনে ছোট একটা নাটিকা অভিনয় করবে বলে ঠিক করেছিলো। স্টেজে উঠে হল্‌-ভরা লোক দেখে যতীন গেলো ঘাবড়ে, পার্ট একদম মনে করতে পারলে না। কয়েকবার আম্‌তা আম্‌তা করে শেষে নিরুপায় হয়ে চোঁচা ছুট দিলে পর্দা ছিঁড়ে—গ্রীনরুমের দরজা ভেঙে। হল্‌ শুদ্ধু লোক হো হো করে হেসে উঠলো। ভজুও কিন্তু কম অপ্রতিভ হলো না, কিন্তু তার রাগও হলো প্রচণ্ড। পার্টে অনেক কিছু প্যাঁচ দেখিয়ে সে সবাইকে মাত করে দেবে—এই

ভেবে, আজই সকালে সে বার পঁচিশ থার্ড-মাষ্টারের কাছে রিহার্সাল দিয়েছে, আর এক মুহূর্তে ষ্টুপিড, গাধা যতেটা কিনা তা ভেস্তে দিলে! খানিকক্ষণ অসহায়ের মতো এক ঘর লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সেও ছুটে পালালো—লজ্জা লুকোতে নয়, যতেকে আচ্ছা করে ছু'ঘা দিতে। রাস্তায় এসে দেখতে পেলে হতভাগাটা ডালমুট কিনে চিবুচ্ছে আর হাসছে। গো মূর্খটা তো হাসবেই।

ভজু ঠিক একটা নেকড়ে বাঘের মতো যতীনের ঘাড়টা খাম্‌চে ধরলো, 'পাজি হতচ্ছাড়া, এতো করে মুখস্থ করে এসেও ভুলে গেলি?'

লেগে গেলো ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি, যতীনের নাক কেটে রক্ত বেরুতে লাগলো। মাষ্টাররা এসে ঝগড়া মেটালেন বটে, কিন্তু পরদিন ইস্কুলের নীচের তলায় বড়ো হলটায় এক বেঞ্চিতে ছু'জনকে গাধার টুপি পরিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। ওরা হাত বাড়িয়ে পরস্পরের কান মলছে। ভজু বলছে, 'তুই আমার কানে ঘা করে দিয়েছিস কেন স্টুপিড?' কানের ওপর ওরা পরস্পরের নখের তীক্ষ্ণতাকে পরীক্ষা করছে।

সেই থেকে ওদের ভীষণ ঝগড়া—কেউ কারুর সঙ্গে কথা তো কয়ই না, দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অতুলের কাছে নতুন কিছু জানবার ওদের আগ্রহ নেই, পরস্পরকে টেক্কা দেবার আর তাগিদ বোঝে না। ছু'জনে এক মনে পড়া করে। অতুল ভজুকে যদি বলে,'যতীন আজ এ অঙ্কটা একবারেই পেরেছিলো, তখন ভজু রেগে উঠে বলে, 'যান, আমার অঙ্কে গোল্লা হলেই যথেষ্ট।'

যতীনকে যদি বলে, 'ভজুর ট্রানশ্লেশানগুলি সব শুদ্ধ হয়েছে, বলে দিতে হয়নি' তখন যতীন বিরক্ত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমার লাষ্ট হলেও কিছু এসে যাবে না। ওকেই পড়িয়ে আসুন গে।'

এমনি করে ওরা পরস্পরকে এড়িয়ে চলে; পরোক্ষে কেউ কারুর প্রশংসা শুনলে মারমুখো হয়ে ওঠে। ইস্কুলে ওরা একে অন্যের

পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছে। যতীনের হাতে ছেলেদের নতুন কোন্ বই বা পত্রিকা এসেছে সে খবরটি লুকিয়ে ভজুর জানা চাই। ভজু কোন্ দোকান থেকে এই নাগরা জোড়া কিনে এমন পা নাচাচ্ছে—তা আজই যতীনের জানতে হবে, কাল অমনি এক জোড়া কিনে তাকেও পায়ের ওপর পা তুলে বসতে হবে। অন্যান্য ছেলেরা ওদের মিলন ঘটাবার জন্যে ভারি ব্যস্ত, কিন্তু ভজু বাঘের সামনে যাবে, তবু যতের সামনে যাবে না; আর যতীন ভূতের সঙ্গে বরং কোলাকুলি করবে, কিন্তু ভজুটার ছায়া মাড়াবে না কখ্‌খনো।

কিন্তু বিপদ এলো অন্য দিক দিয়ে।

একদিন ভজু অতুলকে বললে, 'এই খাবারটুকু মা আপনাকে খেয়ে নিতে বললেন।'

অতুল কিন্তু খাবারের থালা ছুঁলেও-না।

ভজু বললে, 'আপনি বামুন বলে খাবেন না?'

অতুল বললে, 'না। জাতিভেদ তো আমি মানিনে।'

ভজু বললে, 'তবে?'

অতুল শুধু বললে, 'তা তুমি বুঝতে পারবে না।'

আর একদিন ভজু অতুলের কাছে একটা পুঁটলি রেখে বললে, 'শীতে গায়ে আপনার গরম জামা নেই, মা আপনার জন্যে একখানা আলোয়ান দিয়েছেন।'

দরজার ফাঁক থেকে মা বললেন, 'নাও বাবা, এই দারুণ শীতে শুধু একটা ছেঁড়া শার্ট পরে আছো, দেখে আমার, মায়ের প্রাণে সয় না।'

অতুল স্নিগ্ধ স্বরে বললে, 'এতেই আমার বেশ শীত মানে।'

আলোয়ান কিছুতেই সে নিলে না, বরং তার পরদিন থেকে তার দরিদ্রের গর্ব দেখাতে খালি পায়ে, গায়ের ওপর শুধু একটা খদ্দরের চাদর টেনে পড়াতে এলো।

যতীনের বাড়ীতেও দেখাদেখি ঐরকম কাণ্ড ঘটছে হয়তো।

সেদিন যতীনের বাবা মুটের মাথায় বাজার নিয়ে ফিরছেন, অতুলকে বললেন, 'এই ছোকরা, ঝাঁকাটা নামিয়ে দাও তো!'

অতুলের পাংশু মুখ দেখে যতীন বললে, 'আমি দিচ্ছি, নামিয়ে।'

বাবা বললেন, 'তুই পারবি কেন?'

যতীন হেসে বললে, 'আমি দু-বেলা ব্যায়াম করি না?' মাষ্টার-মশায়ের প্রতি বাবার ব্যবহারটা যে সঙ্গত হয়নি, তা বুঝে যতীন লজ্জায় একেবারে এতটুকু হয়ে গেলো।

ভজুর বাবা আদর করে বললেন, 'আলোয়ানখানা নিলে না কেন, অতুল? শীতে এতো কষ্ট পাচ্ছো।'

এ অযাচিত করুণাও অতুলকে কম অপমানিত করলে না, সে তেজী কণ্ঠে বললে, 'কে বললে আপনাকে, আমি কষ্ট পাচ্ছি? শত কষ্ট পেলেও পরের দয়া ভিক্ষা করতে আমার হাত ওঠে না। আমার মনুষ্যত্ব অপরাধী হয়।'

ভজুর বাবার কাছে কথাগুলি মনে হলো দাম্ভিক, তাই তিনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, 'এমনি খালি গায়ের ওপর চাদর টেনে পড়াতে আসাটা ভদ্রতা নয়।'

আর কথা নেই। অতুল স্পষ্ট করে বললে, 'বেশ। আপনাদের ভদ্রতা আমি চাইনে।' বলে সে সোজা বেরিয়ে চলে গেলো যতীনদের বাড়ী, সেখানেও ভাগ্য তার বিমুখ হয়েছে। অতুলকে ঢুকতে দেখেই যতীনের বাবা বললেন, 'এই যে, তুমি এসেছো। চাকরটার আজ জ্বর হয়েছে, বাজার করে আনো দিকিনি। আজকে আর পড়াতে হবে না। বাজার করাও তো একটা কাজ। আমার জন্যে আব সের বেশ বড়ো সাইজের গলদা চিংড়ি এনো কিন্তু।'

অতুল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যতীনের বাবা পয়সা গুণে ওর হাতে দিচ্ছিলেন, অতুল তার প্রসারিত হাতটা সবেগে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আবার সেই সীমাশূন্য পথ।

আবার সেই নিরানন্দ দিনযাপন। তবু সে তার আত্মসম্মানের অমর্যাদা সইবে না। মাষ্টারমশায়ের জন্যে যতীনের মন কিন্তু কেঁদে উঠেছে। ইস্কুল-ফেরতা সে অতুলের মেসে গেলো দেখা করতে—জল খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে সে বিকেলবেলা লুকিয়ে এসে মাষ্টার-মশায়ের কাছে পড়ে যাবে। এসে দেখলে, ঘরে অতুল নেই, তক্তপোষের ওপর বসে আছে ভজু।

ভজু এবার যতীনকে দেখে মুচকে মুচকে না হেসে থাকতে পারলে না; যতীনও দিলে ফিক্ করে হেসে। যতীন বন্ধুর গা ঘেঁষে তক্তপোষে বসে পড়লো—মাষ্টারমশাই কতক্ষণে ফেরেন তার অপেক্ষা করতে হবে। মাষ্টারমশাই বিদায় নিয়ে ওদের দু-জনকে মিলিয়ে দিয়েছেন। ওরা বসে পরামর্শ করতে লাগলো—এবার আর আলাদা নয়, দু-জনে ওঁর কাছে এসে একসঙ্গে পড়বে, একই ঘণ্টায়। কিন্তু রাত হয়ে এলো, তাঁর ফেরবার নামই নেই যে! দুই বন্ধু ম্লান মুখে ফিরে চললো। পরের দিন এসেও মাষ্টারমশায়ের তারা দেখা পেলো না। তার পরের দিনও না।

অতুল তার মাকে চিঠি লিখলো:

শ্রীচরণেষু—মা, দুটো টিউশানিই গেলো। গরিব বলে একদল করে কৃপা, একদল করে ঘৃণা—দুটোই আমার কাছে অসহ্য। আমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গাছতলায় বসে তকলি কাটছি।

পড়া আমার এখানেই শেষ। জানি, কলেজে পড়ে অনেকে বড়ো হয়েছেন কিন্তু কলেজে না পড়েও বড়ো হয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা বিরল নয়। কিন্তু তকলিতে সুতো কেটে আমি বেশি আনন্দ পাচ্ছি।

আমি জেলে যেতেও পারি কিম্বা জাহাজের খালাসী হয়ে ভেসেও পড়তে পারি—আমার জন্যে তুমি ভেবো না। প্রণাম নিও।

তোমার অতুল

ডাক্তারের ডাক পড়লো। হুকুমালি তালুকদারের বড়ো ছেলে আক্কেলালির জ্বর। একজনের গায়ে দু-জনের জ্বর। খুব প্রবল!

বললে, 'ডাকো ডাক্তারকে।'

ফকির-ফোকরার তোয়াক্কা রাখেনা হুকুমালি। সে লেখাপড়া জানে না বটে, কিন্তু তার বিস্তর অবস্থা। তার জমি-জায়গা অঢেল, গরু-মোষ অনেকগুলি। যারা গরিব, উর্মি লোক, ক্ষুদ্দুর প্রজা, তারাই ফকির-ফোকরার খবর করে। ডাক্তার না ডাকলে হুকুমালির মান থাকে না।

অবস্থার গুণে হুকুমালির এটুকু বুদ্ধি হয়েছে যে, তুকতাকে ব্যামো সারে না। ব্যামো সারে ওষুধে। আর, কোন্ ব্যামোয় কি ওষুধ লাগে, বলতে পারে ডাক্তার। তাছাড়া, শহরে দেখে এসেছে হুকুমালি, যারা বড়লোক তারা দরগায় গিয়ে সিন্নি মানে না, ডাক্তার ডাকে। হুকুমালি ডাক্তার ডাকলো।

তিনখানা গাঁয়ে একজন ডাক্তার। ডাক্তার আমাদের শুকলাল বারিক। আগে শহরে কম্পাউণ্ডারি করতো। ফেল-করা কম্পাউণ্ডার। হাতে-হেতেরে কাজ শিখে নিয়ে এখন বুক ঠুকে এই বন-বাদাড়ে বসে ব্যবসা করছে। নাপিতের কাছে থেকে ফাড়ন-চিরণ শিখেছে, এমন দু-একজন নরুনে কবরেজ আছে, কিন্তু ডাক্তার বলতে একা শুকলাল। আস্ত এক টাকা ফি তার। ফাড়তে পারে বটে, কিন্তু ফুঁড়তে পারে না। কবরেজদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনা শুকলাল।

আর, শুকলাল ছাড়া কে সার্টিফিকেট দেবে শুনি, কবরেজরা তো সব টিপ-পণ্ডিত, লিখতেই পারে না, সার্টিফিকেট দেবে কি!

সাক্ষীদের কেউ গেছে ভুঁই রুইতে, কেউ গেছে হাটে সওদা নিয়ে, মোকদ্দমার মুলতুবি চাই। নিমোনিয়া, কলেরা, ব্রঙ্কাইটিস,

ড়ায়রিয়া—ঠিক-ঠিক বানান করে সা়টিফিকেট লেখে শুকলাল। নামের আগে জাঁকালো করে 'ডাক্তার' লেখে। সব মুসবিদা তার মুখস্থ। এমনভাবে বিতং দিয়ে লেখে যে, কেউ খুঁত ধরতে পারে না। যদি কখনো অগ্রাহ্যও হয়, তবে ফের মোকদ্দমার ছানির সময়ে মোকাবিলা সাক্ষী হয়ে আরেক দফায় রোজগার করে।

তা ছাড়া ওসব গো-বদ্যিদের কি তার মতো ডিসপেন্সারী আছে?

'আপনাকে ডেকেছে বড়ো-মিয়া।' হুকুমালির হালিয়া চাকর এসে খবর দিলো, 'এখুনি যেতে হবে।'

গ্রেপ্তারী পরোয়ানার চেয়েও তেজী। শুকলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

সাধ্য নেই এ পরোয়ানা সে গরকবুল করে। তিন-তিনটে গাঁ বড়ো-মিয়ার কবজার মধ্যে। শুকলালের যা কিছু ব্যবসা-পসার তা শুধু সে এই বড়ো-মিয়ার তাঁবে আছে বলে। বড়ো-মিয়ার কথার অবাধ্য হওয়া যায় না।

অথচ বাধ্য হতে গেলে দুর্দশার একশেষ। প্রথমতঃ তিনটে মাঠের কাদা ভাঙতে হবে পর-পর। তারপর যদ্দিন না আক্কেলালি ভালো হয়, আটক থাকতে হবে সে বাড়িতে। নিজের হাতে রেঁধে খেতে হবে। বিনিময়ে এক পয়সাও মজুরি পাবে না। ফি চাইবার তার এক্তিয়ার নেই। বড়ো-মিয়ার খুশিতেই সে বেঁচে আছে। তার খুশিতেই সে রুগী পায়। তার বাড়ি-ঘরে আগুন লাগে না।

কোটের ওপর চাদর ঝুলিয়ে, রবারের জুতো হাতে নিয়ে চললো শুকলাল। আরেক হাতে ওষুধের বাক্স। পিছনে হালিয়ার মাথায় শুকলালের বিছানা। তার কাঁধের ব্রাকেটে ছাতা ঝুলছে শুকলালের।

* * *

কেমন দেখলে? হুকুমালি ফরসিতে টান মারতে মারতে শুকলালকে জিজ্ঞেস করলে।

ঢোঁক গিলে, মাথা চুলকে, গলা খাঁকরে শুকলাল বললে, 'একটু জটিল বলে মনে হচ্ছে। তা দু-দিনেই সেরে যাবে।'

অনেক ভেবে-চিন্তেই বলেছে শুকলাল। সামান্য অসুখ বললে হুকুমালির মর্যাদার প্রতি অবমাননা দেখানো হয়, আর দু-দিনে না সারলেও নিজের মান থাকে না!

'ঠিক দু-দিন। মনে থাকে যেন!'

শুকলাল চোখে সর্ষে-ফুল দেখলো। ভাবলে, আগুন লাগে বুঝি তার ডিসপেন্সারীতে।

দু-দিনে গা ঠাণ্ডা হলো না। বিছানার ওপর আক্কেলালি এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগলো।

'কি, কিসের ডাক্তারী শিখেছো?' হুকুমালি গাল দিয়ে উঠলো, 'এক কুইনিন ছাড়া বাপের জন্মে আর কোনো ওষুধ জানোনা?'

একটু নিচু হয়ে বললে শুকলাল, 'সাতদিন না গেলে জ্বরের চরিত্র ঠিক বোঝা যায় না।'

'রাখো তোমার ও-সব হামবড়াই। আর দু-দিনে যদি না সারাতে পারো, শহর থেকে বোস ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে!'

* * *

হুকুমালি সালিশী করতে গিয়েছিলো পাশ-গ্রামে; দু'দিন পরে ফিরে এসে দেখলে আক্কেলালির অবস্থা বড়ো সঙ্গীন। চোখ-মুখ বসে গেছে, হুঁস-বোধ নেই, শরীরের গিঁট-গাঁট ঢিলে হয়ে পড়েছে সব।

'যাও, বোস ডাক্তারকে নিয়ে এসো। নাও খোল শীগ্‌গির।' ফরমান জারি করলে হুকুমালি।

'আমি যাই, নিয়ে আসি গে।' কাঁচুমাচু মুখে বললে শুকলাল।

'না, তুমি গেলে রুগীর তাউৎ করবে কে?'

* * *

একেবারে শহরে যেতে না পারলেও নদীর ঘাটে বোস ডাক্তারের

সঙ্গে আগ বাড়িয়ে দেখা করলে শুকলাল। বললে, 'ভুল-টুল যদি হয়ে থাকে চিকিচ্ছায়, সবাইর সামনে কিন্তু ফাঁস করে দেবেন না। আর, ভুল-টুল একটু না করলে বা আপনাদের ডাকবে কেন? এক ডাক্তার ভুল করে বলেই তো আরেক ডাক্তারের ডাক পড়ে।'

বোস ডাক্তার দেখলে তন্ন তন্ন করে। বললে, 'চিকিৎসা ঠিকই হচ্ছে, তবে আরো তেজী ওষুধ দেওয়া উচিত। দেওয়া উচিত ইনজেকশান।'

'এতক্ষণ দাওনি কেন?' হুকুমালি তেড়ে এলো শুকলালকে।

'গাঁয়ে এ ওষুধ কোথায়? আমার ডিসপেন্সারী তো কাহিল।'

'যাও তবে—নিয়ে এসো গে শহর থেকে।'

'বিলিতি ওষুধ নেই, পাওয়া যাবে দিশি-মার্কা।'

যাই-ই পাওয়া যাক, যত টাকা লাগে লাগুক, দেখে শুনে নিয়ে আসুক গে, শুকলাল।

হুকুমালি বোস ডাক্তারকে ফি দিলে পঞ্চাশ টাকা। শুকলাল চোখ টিপলে।

বোস ডাক্তার বললে, 'দুই জোয়ারের রাস্তা, এখানে ফি আমার একশো টাকা।'

'তা গোসা করবার কি আছে? পাইয়ে দিচ্ছি আপনাকে বাকি পঞ্চাশ।' হুকুমালি তলব করলে পড়শীদের। পাশানুল্লা, মানেরদ্দি, সোনাদ্দি, গহুরালি, সরিফমোল্লা, কলস সর্দার—এমনি প্রায় কুড়ি বাইশজন এসে হাজির হতে সে বললে, 'শহর থেকে বড়ো ডাক্তার এসেছে, যার যা অসুখ, এইবেলা দেখিয়ে শুনিয়ে ব্যবস্থা করে নে সব। বার কর্ নজরানা।'

ঐ তো মহামুস্কিল। ভাদ্রমাসে এসময়ে সবারই জ্বর-জারি হচ্ছে! কারুর পেট খারাপ, কারুর বুকে সর্দি-বসা। এক-হাঁটু জলে মাঠে কাজ করে কে থাকতে পারে আস্ত-সুস্থ? তা সবাই তো শুকলালের কাছ থেকে হলদে কুইনিন কিনে খেয়েছে। শুকলালকে টাকা

দিয়েছে একপ্রস্থ। আবার এ গুনগার কেন? তেমন খাওয়া-পরা নেই, বাত-বন্যার দেশ, অসুখ সবারই গায়ে একটু-না-একটু লেগে আছে। হুপ্ করে জ্বর না এলে বা পেটের ব্যথায় টোক্কা-খাওয়া, কেন্নো না হলে কে আবার ডাক্তার ডাকে?

না, এ সুযোগ ছাড়া হবে না কিছুতেই। বাড়ির দরজায় কবে আসবে এমন পাশ করা শহুরে ডাক্তার? হুকুমালির হুকুম। অমান্য করার সাধ্য নেই। এর চোখ টেনে, ওর জিভ বার করিয়ে, এর পেট টিপে, ওর বুক ঠুকে, বোস ডাক্তার নানা রকম ব্যবস্থা বাৎলে দিলেন। কারু তু-টাকা, কারু চার-টাকা করে নজরানা, অর্থাৎ জরিমানা। বাকি পঞ্চাশ টাকা উসুল হয়ে গেলো দেখতে দেখতে।

এ পঞ্চাশের থেকে পঁচিশ শুকলাল নিলে। তার কমিশন। সবচেয়ে যে বিদ্বান ব্যবসা, ওকালতি আর ব্যারিস্টারি—সেখানেও মামলা জুটিয়ে দিলে দালালি পাওয়া যায়। ডাক্তারের বেলায়ই বা তার উলটোটা হবে কেন? রবি বোসকে না ডেকে, মনসা মুখুজ্জেকেও ডাকা যেতো তাহলে।

*   *   *

তুই ডাক্তার নৌকোয় উঠলো। বোস যাচ্ছে ফিরে আর শুকলাল যাচ্ছে ওষুধ কিনতে।

'কতো আনলে ওষুধের জন্যে?' জিজ্ঞেস করলে বোস-ডাক্তার।

'তিরিশ টাকা।' শুকলাল বললে।

'টাকা সাতেক লাগবে হয় তো।'

'বাকি টাকায় কিছু ওষুধপত্র কিনে নিয়ে যাবো ডিসপেন্সারীর জন্যে। এদের জ্বর একবার সারলেও আবার জ্বর হয়। ঘরে ঘরে জ্বর হয়। ওটা বন্ধ করবার জন্যে—কিছু টনিক দরকার। বুঝলেন, খুব ডিম্যাণ্ড হবে ওসবের।'

শহরের সেরা দাওয়াইখানা গুরুচরণ ফার্মেসী। তার থেকে এক

বাক্স ইনজেকশান কিনলে শুকলাল। কিনলে মিকশ্চার পাউডার। সেলট্যাক্স্ সহ সাত-টাকা সাড়ে তেরো আনা। আর বাকি টাকার নিজের ডিসপেন্সারীর জন্যে সালসা-টনিক।

গাঁয়ে এসে যখন পৌঁছালো তখন আক্কেলালির বে-আক্কেল অবস্থা, শ্বাস উঠেছে। বোস ডাক্তার দূরের কলে এসে এ অবস্থায় সামনে কোনোদিন নিজেকে পড়তে দেয় না। পাছে চোখের ওপর রুগী মারা গেলে ফি না দেয়! গেঁয়ো ডাক্তারের ওপর ফোঁড়াফুঁড়ির চরম দায়িত্ব রেখে, শুধু ব্যবস্থা দিয়ে সরে পড়ে। বলে, আমাদেরকে ডাকেই একেবারে শেষ সময়ে।

* * *

'ইঞ্জিশন' এসেছে, 'ইঞ্জিশন' এসেছে, বাড়ির সবাই কলরব তুললে। ছুঁচের এক ফোঁড়েই আক্কেলালি চোখ মেলবে। আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসবে। আর ভয় নেই। কোট খুলে ফেললে শুকলাল।

প্যাক করা আঁটা বাক্স—এক কোণে খানিকটা সুতো ঝুলছে। এই সুতো ধরে টানলে বাক্সের ডালা সুতোর লাইন ধরে কেটে যাবে। ভেতর থেকে বের হবে ইনজেকশানের য়্যাম্পিউল। ভেতরে ছুরির পাত আছে, তা দিয়ে ডগা কেটে ছুঁচে ভরে নিতে হবে ওষুধটা। তারপর ফুঁড়তে হবে বিসমিল্লার নাম নিয়ে।

শুকলাল বাক্সের ডালা ছিঁড়লে। কিন্তু কোথায় য়্যাম্পিউল! চারটে খোপে চারটে কাগজের ঢিপলে!

ওষুধ নেই! শুকলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

হুকুমালি পাথর হয়ে রইলো। হাতের লাঠিটা কাঁপতে লাগলো ঠক্ঠক্ করে। এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করতে লাগলো শুকলাল। এখন কি করে, কি করে বাঁচায় আক্কেলালিকে? হুকুমালি জুলুম করেছে, বোস ডাক্তার জুলুম করেছে, কিন্তু এ জুলুমবাজির তুলনা কোথায়? মুমূর্ষুর প্রাণ নিয়ে জুয়োচুরি! প্রাণ শুধু আক্কেলালিরই

যাবে না, শুকলালেরও যাবে। বাক্সের পেটের মধ্যে সে ঢুকতে পারতো না এ বুঝলেও হুকুমালি তাকে ক্ষমা করবে না। ব্যবসাপত্র তুলে এবার চলে যেতে হবে চর অঞ্চলে। ডাক্তারির তকমা খুইয়ে হতে হবে হাতুড়ে নাপিত।

* * *

ডিসপেন্সারীতে চুপচাপ বসে ছিলো শুকলাল। অনেক দিনের মেঘলার পর আজ রোদ উঠেছে। কিন্তু শুকলালের মনে এক ফোঁটাও সুখ নেই। কবে যে হুকুমালির আক্রোশে দাঙ্গা ও আগুনের আকার দেখা দেবে তার চারপাশে, তারই ভাবনায় সে মুষড়ে আছে। যে প্রকাণ্ড জুয়োচুরিটা শুকলালের হাতের ওপর হয়ে গেলো, তাতে শুকলালের কোনই অংশ নেই—একথা হুকুমালিকে কেউ বিশ্বাস করতে দেবে না।

লাঠির শব্দে শুকলাল ত্রস্ত হয়ে দেখলে, সামনেই হুকুমালি। কতক্ষণ দু-জনে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে।

মন খারাপ করো না, শুকলাল। তোমার জন্যে এই একতোড়া টাকা এনেছি। বলে একথলে টাকা হুকুমালি শব্দ করে শুকলালের টেবিলের ওপর রাখলে। বললে, 'তিন-গাঁয়ের মধ্যে এই একটা মাত্র ডাক্তারখানা। এই টাকা দিয়ে ভালো দোকান থেকে ভালো দেখে ওষুধ কেনো তুমি, তোমার ডিসপেন্সারী সাজাও। আমার আক্কেলালি গেছে, কিন্তু পাশাহুল্লা মানেরদ্দি, সোনাদ্দি, গহুরালির ছেলেরা যেন না মরে।

বিকেলবেলা, গ্রে-স্ট্রীটের ধারে এক চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি হঠাৎ দেখতে পেলাম ওদিকের ফুটপাতে আমাদের পাড়ার ভূতনাথ-বাবু। চায়ের পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে রাখলাম—বুঝলাম, রাতের খাওয়া আজ আর জুটছে না।

ভূতনাথবাবুদের কাঠের কারবারে অনেক পয়সা। তাছাড়া অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী বন্ধক রেখে উঁচু সুদে টাকা ধার দেওয়া তাঁর আর এক ব্যবসা। যারা ঠিক সময়ে ধার শোধ করতে পারে না, তাদের ঘরবাড়ী তিনি আত্মসাৎ করেন। তারপর দেন বেচে। এই করে জমিয়েছেন বিস্তর, কিন্তু এমন কৃপণ আর ভূ-ভারতে দেখা যায়না। খান চুনো-মাছ আর পুঁই চচ্চড়ি, নাপিতকে পয়সা দিতে হবে বলে একমুখ দাড়ি আর একমাথা চুল তাঁর কায়েমী হয়ে আছে। বয়সে বুড়ো, পায়ে তালপাতার চটি, গায়ে একটি গরম ওভার-কোট। শীত-গ্রীষ্ম মানেন না—ঐ ওভার-কোটই তাঁর গাত্রা-বরণ। ওজনে সের পাঁচেক হবে—এ-পিঠে ও-পিঠে কমসে কম পঁচিশটা পকেট! কাঠের কারবারের লাভের প্রথম টাকা দিয়ে চোরাবাজার থেকে দু-তিন হাত ফেরতা ঐ কোটটি তিনি কেনেন সস্তা দামে। সে আজ বত্রিশ বছর হলো। সেই থেকে ঐ কোটটা তিনি গা থেকে নামাননি। খালি রবিবার তিনি জামা খুলে স্নান করেন, কেন না সেদিন দোকান তাঁর বন্ধ থাকে। ঘুমোবার সময় কখনো করেন লেপ, কখনো মাথার বালিশ—কখনো বা মাত্র তোষক, অর্থাৎ কোটটা তাঁর গায়েই থাকে। কোটটার সর্বাঙ্গে তালি আর সেলাই। ভূতনাথবাবুর ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খালি তাঁর ওভার-কোটের পকেটের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে।

ঐ ওভার-কোটটি দেখলে সেদিন আর খাওয়া জোটেনা—এমনি একটা প্রবাদ এ-পাড়ায় প্রচলিত ছিলো। ওঁর বাড়ীর নম্বর হচ্ছে ১১৩, ম্যাট্রিকে নবীনের রোলনম্বর ১১৩ ছিলো বলেই নাকি সে আর পাশ

করতে পারেনি। অন্ততঃ আজকে আমার চা খাওয়া যে বন্ধ হলো তাতে আর সন্দেহ কি? ভূতনাথবাবু বেশ নীচু হয়ে রাস্তার যত ধুলো কাঁকর নোংরা—সমস্ত ঘাঁটতে ঘাঁটতে রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে আমারই কাছে এসে হাজির হলেন দেখছি। আমাকে দেখেই তাঁর সে কী ভেউ ভেউ-কান্না—'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, হীরু। একেবারে পথে বসিয়েছে, একেবারে।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললাম, 'কী, কী হলো? মোটর চাপা? গাঁট কাটা? এমন করছেন কেন? একটা গাড়ী ডেকে দেবো? বসে পড়লেন কেন ধুলোর ওপর? মাথা ঘুরছে? হাওয়া, করবো একটু? কী হয়েছে বলুন না, ছাই। পাহারাওলা ডাকবো?'

পাহারাওলার নাম শুনেই বোধহয় বুড়োর জ্ঞান এলো। অমনি আমার হাত দুটো চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন, 'আমাকে একেবারে গাছতলার ভিখিরী করে ছাড়লে! একটা জলজ্যান্ত একশো টাকার নোট হাত থেকে হাওয়ায় উড়ে গেলো।'

'—হাওয়ায় উড়ে গেল! বলেন কি!'

'—হ্যাঁ ভাই! জানোই তো, টাকাকড়ি আমি জামার পকেটে রাখি না; ব্যাটারা টের পেয়ে কখন ঠিক পকেট মেরে দেবে। সেই ভয়ে সব সময় রাখি হাতের মুঠোয়! সকালে আজ আমাদের মিনি বেড়ালটার বাচ্চা হয়েছে। তারই দুটো পকেটে ছিলো। সে দুটোর কোনো সাড়াশব্দ নেই দেখে পকেটে কখন অজানতে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি—অমনি দেখি হাতের মুঠোয় নোট নেই!'

বললাম, 'আর বাচ্চা দুটো?'

ভূতনাথবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, 'দুত্তোর বাচ্চা! আমার গেলো টাকা, আর তোমার কাছে বেড়ালের বাচ্চা দুটোই বড়ো হলো? কলেজের ছোকরা, বাপের পয়সায় খাও, তোমার আর কি!'

অপরাধীর মতো বললাম, 'কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?'

'—লোকের উপকার করতে কি তোমরা এগোও? সে ছিলো আমাদের সময়—পরের জন্যে বিষ খেতে পারতাম।—একশোটা টাকা—কি হবে হীরু? আমার সঙ্গে একবারটি এসো না ভাই!' পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম সেই কালীতলার কাছে, সেখান থেকেই ফুটপাত ধরে খুঁজে খুঁজে আসছি। খালি একটা ফুটপাত দেখা হয়েছে, তুমি একবারটি ওদিকটা দেখতে দেখতে এগোবে ভাই?'

অবাক হয়ে বললাম, 'বলেন কি, কালীতলা পর্যন্ত?'

আমার পিঠে হাত রেখে ভূতনাথবাবু বললেন, 'যদি খুঁজে পাও হীরু, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়ী ফিরে যাবার ট্রাম ভাড়া দেবো। কিম্বা ডবল এক কাপ চা! তুমি তো পকৌড়ি খুব ভালোবাস, না?'

অগত্যা ফুটপাত খুঁজতে খুঁজতে এগোতে লাগলাম। আমি ডাইনে, উনি বাঁয়ে। হঠাৎ এক সময়ে চেয়ে দেখি ভূতনাথবাবু এক রাজ্যের পথ পিছনে পড়ে আছেন। আমি চলেছি তাড়াতাড়ি আর উনি শামুকের মতো। ফিরে গিয়ে ওঁকে ধরলাম। দেখি, একটা ডাষ্টবিনের মধ্যে মুখ নামিয়ে উনি হাত দিয়ে ময়লা ঘাঁটছেন। ওঁর ওভার-কোটে একটান মেরে বললাম, 'এঃ, করছেন কি?'

ভূতনাথবাবু মুখ তুলে বললেন, 'বলা তো যায় না, কোনো ছোটো ছেলে হয়তো কুড়িয়ে পেয়ে এইখানে ফেলে গেছে। সবাই তো আর নোট চেনে না। তুমি পেলে না এতক্ষণেও? তুমি কিছু কাজের নও হীরু! পারো খালি চা গিলতে। ওদিকটা তাহলে কিছু দেখা হয়নি? আমি যাই ও-পারে, তুমি এদিকটা দেখতে দেখতে এগোও।'

ভূতনাথবাবু ওদিকের ফুটপাথে চলে গিয়ে এক পা এগোন আর হাঁক পাড়েন, 'হীরু—পেলে? চোখ যদি এতই খারাপ, তবে চশমা নাও না কেন? অন্ধকারে দেখতে না পেলে একটা দেশলাই কিনে নাও শীগ্‌গির! মোটে একটা তো পয়সা! পরের জন্যে একটা পয়সা খরচ করতে পারো না? তোমাদের বয়সে আমরা—ও কি, হীরু?'

পাশের গলি দিয়ে সরে পড়ছিলাম, ভূতনাথবাবু পেছন থেকে এসে ঘাড় চেপে ধরলেন ? বললেন, 'পালাচ্ছো কোথায় ?'

বললাম, 'নোটটা তো আপনার উড়ে এসে এই গলিতেও পড়তে পারে, কি বলেন ? এই দিকেই বরং একটু খুঁজে দেখি না ?'

ভূতনাথবাবু অসহায়ের সুরে বললেন, 'তারচেয়ে আমার বাড়ী চলো হীরু। বাড়ীতেই না হয় খুঁজি গে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'এই না বললেন, নোটটা রাস্তার মাঝে হাতের থেকে উড়ে গেছে, বাড়ীতে পাবেন কি করে ?'

'—বলা কি যায় ? ওটার পেছনে পেন্সিল দিয়ে আমার নাম ঠিকানা লেখা ছিলো যে! কেউ পেয়ে পুলিশের ভয়ে হয়তো শেষকালে আমার বাড়ীতেই ফিরিয়ে দিতে গেছে এতক্ষণে। শীগ্‌গির করে চলো তো হীরু, বেশি দেরী করলে লোকটার হয়তো দেখা পাবো না, শেষ পর্যন্ত।'

হেসে বললাম, 'আমার গিয়ে কি হবে ?'

'—না না, চলো ; লোকটার দেখা না পেলে কাল সকালে বরং রাস্তায় আবার খোঁজা যাবে। কাল যদি খুঁজে পাও হীরু তো তোমাকে ঠিক একখানা একসারসাইজ খাতা কিনে দেবো। রুল-টানা খাতা তো ? আচ্ছা। চলো। বাড়ীটার তেতলার ছাতে শুনেছি নাকি ভূত আছে। তুমি তো শুনেছি খুব সাহসী, চলো, লণ্ঠনটা নিয়ে ছাতটাও একবার খুঁজে আসবে।'

বললাম, 'হ্যাঁ, কারো ঘুড়ির ল্যাজের সঙ্গে নোটটা আপনার হাতে উড়ে আসতেও পারে।'

গম্ভীর হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, 'আশ্চর্য কী ?'

মজা দেখতে অগত্যা তাঁর বাড়ীতেই এসে হাজির হলাম। ট্রামে, বাসে তিনি যাবেন না ; যে পথে তিনি আগে হাঁটেন নি, সেই পথেরও ধুলো-বালি তিনি হাতড়ে চলেছেন।

বললাম, 'এখানে আপনার নোট কি করে আসবে ? এই পথে তো আসেন নি আগে। হারিয়েছে তো সেই কালীতলার কাছে।'

ভূতনাথবাবু একটা কাঠি দিয়ে রাস্তার কতকগুলো আবর্জনা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, 'এখানেও তো হারাতে পারে, নোটটা। আশ্চর্য কী ? একজায়গায় হারালেই হলো।'

হাসবো না কাঁদবো—কিছু ভেবে পেলাম না।

বাড়ী এসে ভূতনাথবাবু এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনি, বৌ-ঝি—সবাইকে ডেকে জড়ো করে বাড়ীর চতুর্দিকে আনাচে-কানাচে নোট খুঁজতে পাঠালেন। না পেলে কাউকে আর তিনি আস্ত রাখবেন না !

ছেলের বৌদের বললেন, 'শীগ্‌গির ট্রাঙ্ক প্যাঁটরা খুলে বের করো নোট।' নাতি-নাতনিদের বললেন, 'নিয়ে আয় তোদের বইখাতা, কার ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিস, দেখি !'

ভূতনাথবাবু একেবারে ক্ষেপে গেছেন। এবার তোষক-বালিশ সব ফাঁড়তে শুরু করেছেন। কারো বারণ তিনি কানে তুলবেন না। বাধা দিয়ে বললাম, 'নোট আপনার বিছানা-বালিশের মধ্যে ঢুকবে কি করে ?'

ভূতনাথবাবু বললেন, 'তুমি জানোনা হীরু, নোট যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। এক জায়গায় পেলেই হলো। তুমি একবারটি নর্দমাটায় হাত ডুবিয়ে দেখো না ভাই। পেলে এবার তোমাকে ঠিক একটা ঘড়ির ব্যাণ্ড কিনে দেবো। এ বছর ঘড়ির ব্যাণ্ড হলে আসচে বছর নিশ্চয়ই একটা আস্ত ঘড়ি হবে।'

নাতি-নাতনিদের কাউকে দেবেন পুরোনো ট্রামের টিকিট, কাউকে ছেঁড়া বইয়ের মলাট, কাউকে বা পাঁজি থেকে ছিঁড়ে ভৃগু রাজা, শনি মন্ত্রীর ছবি। কিন্তু কেউই খুঁজে পায় না ! জিনিসপত্রে, কাপড়ে-চোপড়ে ঘর-বাড়ী এক হাঁটু হয়ে উঠলো।

এমন সময়ে ভূতনাথবাবুর সেজো ছেলে বাজার থেকে একটাকা সেরের চারটি প্রকাণ্ড ইলিশ মাছ কিনে এনে হাজির। ইলিশমাছ দেখে ভূতনাথবাবু একেবারে তেড়ে এলেন। বললেন, 'আমার হাত থেকে একশোটা টাকা উড়ে গেলো, আর উনি এনেছেন ইলিশ মাছ কিনে! দূর হ' ব্যাটা আমার বাড়ী থেকে।' বলে বুড়ো ভদ্রলোক বরোদার হাত থেকে মাছের বাণ্ডিলটা কেড়ে নিয়ে দূরে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে ফেললেন।

বরোদা তো থ।

ভূতনাথবাবু তার কান ধরে বললেন, 'ব্যাটা খুঁজে বের্ কর্ আমার নোট। নইলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন!'

কে একটা ছোট্ট মেয়ে মাছ ক'টির দিকে এগোচ্ছিলো, ভূতনাথবাবু প্রবল কণ্ঠে ধমকে উঠলেন, 'খবর্দার পুঁটি, ঐ মাছ ছুঁবি তো তোকে আমি বঁটিতে কাটবো! আমার গেলো একশোটা টাকা, আর ওরা এলেন ফূর্তি করতে! আমাদের বাড়ীর কেউ ও মাছ ছুঁতে পারবে না। তোরা সবাই চেঁচিয়ে শোক করতে পারিস না? তাহলেও তো আমার বুকটা জুড়োয়।'

গঙ্গার টাট্‌কা ইলিশ। ভাবলাম, ছুটো সরাই—বুড়ো ঘরের মধ্যে গিয়ে দা দিয়ে তাঁর জাজিম ফাঁড়ছেন—উঠোনটুকু পেরিয়ে মাছগুলির দিকে এগোচ্ছি, কোথা থেকে হুড়মুড় করে তেড়ে এলেন, 'নিলে নিলে, মাছ নিয়ে পালালে, বরোদা। ধর্ হীরুকে। কে জানে ঐ মাছের পেটের মধ্যেই আমার একশো টাকার নোটটা লুকিয়ে আছে কিনা। ধর্ ধর্—গেলো, গেলো।'

উঠোন পেরিয়ে ভূতনাথবাবু নিজেই আমাকে ধরতে আসছিলেন, কিন্তু পা হড়্‌কে গিয়ে একেবারে চীৎপাত!

অমনি তাঁর ওভার-কোটের পকেট ঠেলে রাজ্যের জিনিসপত্র বেরিয়ে আসতে লাগলো। সবাই তাঁকে ধরাধরি করে তুলে বললে,

'আপনার কোটটাই একবার দেখুন না নেড়ে-চেড়ে, কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে, একশো টাকার নোটটা।'

ভূতনাথবাবু কিছুতেই কাউকে কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে দেবেন না। বললেন, 'সব টাকা-পয়সা আমি হাতের মুঠোয় রাখি, খুচরোগুলো কানের ফুটোয়। নোট ওর মধ্যে যাবে কি করে? লুকিয়ে আছে বললেই, থাকবে যেন!'

কিন্তু সবার বাক্স-তোরঙ্গ তিনি ওলোট-পালোট করেছেন, তাই কেউ তাঁকে ছাড়লেন না। গা থেকে জামা খুললেন না বটে, কিন্তু সবাই মিলে তাঁর পকেট উজাড় করে দিলে।

কোট তো নয়, ছোটখাটো একটি যাদুঘর! নীচের পকেট থেকে প্রথমেই বেরুলো বেড়ালের মরা বাচ্চা দুটো, বড়ো ছেলে জ্ঞানদার চুষিকাঠি, বরোদার ঝুমঝুমি, ঘড়ির স্প্রীং, চুলের কাঁটা, খল নোড়া, কাঁচের টুকরো, দড়ি, ভাঙা চামচ—কি যে তাতে নেই, তার হিসেব কে করবে? কিন্তু নোট কোথাও পাওয়া গেল না। সদর ও খিড়কি সমস্ত পকেটই তন্ন তন্ন করে দেখা হলো—কাকস্য পরিবেদনা। এই দেখে ভূতনাথবাবু আরেকবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন, 'তবে কোটের পকেটেও নোট নেই? আমার শেষ পর্যন্ত আশা ছিলো, কোটের একটা না একটা পকেটে ওকে পাবোই। এত সব পুরোনো জিনিস পাওয়া গেলো আর সদ্য হারানো নোটটা পাওয়া যাবে না! আমার কি হবে?' বলে তিনি কোটটা খুলে ফেলে একটা কাঁচি দিয়ে তার লাইনিং কাটতে শুরু করলেন।

কে একজন বললে, 'নোটটা তো আপনার হাত থেকে উড়ে গেছে বললেন, কোটটা কেটে আর কী হবে?'

ভূতনাথবাবু চটে বললেন, 'থাকলে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না? এত জিনিস থাকতে কারুর আপত্তি নেই, একটা একশো টাকার নোট থাকবে—এ আর কারুর সইছে না!'

কোটটা কুটিকুটি করেও নোটের সন্ধান মিললো না। ভূতনাথ-বাবু দাড়ি চুল ছিঁড়ে কাটা-ছাগলের মতো ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন।

অফিসের কাজকর্ম চুকিয়ে দোকানপাট বন্ধ করে এমনি সময়ে ভূতনাথবাবুর সরকার ব্রজেন এসে উপস্থিত। কান্নাকাটি গোলমাল শুনে ভেতরে এসে শুধোলে, 'ব্যাপার কি ?' সব দেখে শুনে তো তার চক্ষু স্থির! আমাকে ও বরোদাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্রজেন বললে, 'নোটটা তো কর্তা দোকানের দেরাজেই ফেলে এসেছেন, আনেন নি মোটেই। আমিই সেটা পৌঁছে দিতে এসেছি।'

ব্রজেনের হাত থেকে নোটটা নিয়ে আমি ছাতে উঠে গেলাম। অন্ধকারে গিয়েই চেঁচানি শুরু করে দিলাম, 'আপনার নোট পেয়েছি ভূতনাথবাবু। শীগ্‌গির উঠে আসুন।'

সিঁড়ি বেয়ে একদঙ্গল ছেলে-মেয়ে ছাতে উঠে এলো, কিন্তু ভূতনাথবাবু সিঁড়ি কিছুতেই ডিঙোবেন না, তাঁকে ভূতে ধরবে!

বললাম, 'আমরা সবাই আছি, ভয় কী ?'

ভূতনাথবাবু বললেন, 'শীগ্‌গির নেমে এসো, হীরু। সত্যিই এবার তোমাকে ল্যাজার দিকে একখানি ইলিশ মাছ কেটে দেবো। নিশ্চয়ই নিজের হাতে কেটে দেবো, হীরু।'

হাসতে হাসতে নীচে নেমে এলাম। তাঁর হাতে নোটটা ফিরিয়ে দিতেই তিনি দু-হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলেন। নাচ থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেলে নোটটা ? ছাতে ?'

বললাম, 'হ্যাঁ। ছাতে উঠতেই সেই ভূতের দলের সঙ্গে দেখা। আমার হাতে নোটটা দিয়ে একজন বললে, "আমাদের রাজার কষ্ট আর সইতে পারি না ; এই নাও তাঁকে তাঁর নোট ফিরিয়ে দাও। আমরা তাঁর প্রজা, তিনি হচ্ছেন ভূতনাথ"।'

একগাল হেসে ভূতনাথবাবু বললেন, 'তা আশ্চর্য কী ?'

মুদিখানা না খুলে শ্যামাকান্ত বইএর দোকান খুলেছিলো, তারপর বইএর দোকান যখন চললোনা, তখন দোকান খুললে সে মনিহারির। যখন তার বইএর দোকান ছিলো, তখন একটা ঘটনা ঘটেছিলো, যা চিরকাল মনে রাখবার মতো। শীতকাল, বন্ধু-বান্ধব দু-একজন আশে-পাশে বসে, কুড়ি-বাইশ বছরের একটা রোগা আধ-পেটা খাওয়া ছেলে দোকানে ঢুকলো বই কিনতে, বিয়েতে কাকে উপহার দেবে বলে। এ-বই দেখে, ও-বই দেখে, কোনো বই-ই তার পছন্দ হয় না। দাম সস্তা, নামী লেখক, রঙচঙে মলাট—সবরকমের কোনোটাই তার মনোমতো নয়। অগত্যা চলেই যাচ্ছিলো সে, বন্ধুদের মধ্যে থেকে হঠাৎ কে একজন যেন চেঁচিয়ে উঠলো—'চোর! চোর!'

ছুট্—ছুট্—সবাই ছুটলো সেই ছোকরার পিছু পিছু। রাস্তার ট্রাম-বাস দাঁড়িয়ে গেলো, মোটরগাড়ীগুলি তেড়ে এসে তার পথ আটকালো। শ্যামাকান্তই প্রথমে ধরে ফেললে তার শার্টের কলারটা, আর একটানে র‍্যাপারটা তার গা থেকে ছিঁড়ে ফেলতেই বেরুলো তার বগলের নীচে একগাদা বই—খানিক আগে যা সে একে একে বাতিল করে এসেছে। প্রথমেই তার মুখের ওপর পড়লো একটা ঘুসি, তারপর ভীষ্মের ওপর শরবর্ষণের মতো, চতুর্দিক থেকে বেপরোয়া ও বে-এক্তিয়ার মার। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে, মশাই?'

'ছোঁড়া বই কেনবার নাম করে দোকানে ঢুকে র‍্যাপারের তলায় করে একগাদা বই চুরি করে নিয়ে এসেছে!'

'চুরি করেছে! চোর!' বলা কওয়া নেই, আগন্তুক পটাপট করে গাঁট্টা চালাতে লাগলো ছোকরার মাথায়। ধরা পড়া চোরকে বেনামীতে মারা চলে; অধিকারের কোন প্রশ্ন তাতে নেই।

হিড়্ হিড়্ করে ছোকরাকে টেনে আনা হলো দোকানে। তারপর শ্যামাকান্ত দরজা বন্ধ করলে। বন্ধু-বান্ধব যারা ছিলো, তারা ফের ফিরে এলো কিনা দেখেও দেখলো না।

শ্যামাকান্ত একটা জোয়ান আর এই চোর নিতান্ত দুর্বল, তবু শ্যামাকান্ত ছেড়ে কথা কইলো না, ছেলেটাকে কথা কইয়ে ছাড়লো।

ছেলেটা তার শার্ট তুলে উপবাস কুঞ্চিত পেট দেখিয়ে বলল, 'বড্ড গরিব বাবু, কিছু খেতে পাইনা—'

কোনো কাজের কথা নয়, তবু কেন কে জানে, শ্যামাকান্ত নিবৃত্ত হলো। ছেলেটার কথাটাই কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো, কেমন অপ্রত্যাশিত। মেরে মেরে শ্যামাকান্তরই নিজের দু-হাতে ব্যথা হয়ে গেছে। অথচ ছেলেটা মারের জন্যে কোনো অভিযোগ করলে না, বললে না, 'ভীষণ লাগছে, হাড়গোড় চুরমার হয়ে গেলো, আর পারছি না সহ্য করতে!' শুধু বললে, 'গরিব, খেতে পাইনা।' যেন লতা পাতা ছেড়ে শিকড়ে গিয়ে সে টান মারলে।

শ্যামাকান্ত ছেড়ে দিলেও পুলিশ ছাড়লো না। শ্যামাকান্তরই নালিশে ও নিশান দিহিতে ছোকরার তিনমাস জেল হয়ে গেলো।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে, শ্যামাকান্ত বইএর দোকান ছেড়ে দোকান খুলেছে মনিহারির। ঈশ্বরের অনুগ্রহে দোকান ক্রমেই জমে উঠেছে, তখন আরো একটা ছোকরা নেওয়া দরকার। যেটা আছে—বিভূতি—খদ্দেরের ভিড় হলে সামলাতে পারে না একা। শ্যামাকান্তর এখন ভুঁড়ি হচ্ছে, নাড়াচাড়া না করতে পারলেই সে খুশি।

অনেকেই আবেদন করেছিলো, কিন্তু তারাপদকে চিনতে শ্যামাকান্তর দেরি হলো না। সেই বই-চোর তারাপদ, জেল-ফেরৎ। তখন শীতে গায়ে তবু অন্ততঃ র‍্যাপার একটা ছিলো, এখন শীতে শার্টের বোতাম ক'টাও সব নেই।

ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলো তারাপদ। সেদিনকার ধরা পড়ার

লজ্জার চেয়েও যেন বেশী। ঘাড় নীচু করে ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে একটা কথা বলে-কী-না-বলে পালাতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু কী মনে হলো শ্যামাকান্তর কে জানে। ভাবলো, ওকে বাঁচাই। গহ্বরের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, টেনে ধরে রাখি। জেলের ফটকটা চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিই।

*　　　*　　　*

একটা কাজের মতো কাজ করলো শ্যামাকান্ত। তারাপদকেই চাকরি দিলো। 'তোমাকেই চাকরি দেবো।' শ্যামাকান্ত একটু গর্বের সঙ্গে বললে, 'ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তোমার শিক্ষা হয়ে গেছে। কী বলো?'

'হয়েছে।' অস্ফুটস্বরে বললে তারাপদ।

'তিনমাস জেল—কম কথা!' শ্যামাকান্ত আবার মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গি করলো—'আশাকরি, আর তোমার অমন দুর্মতি হবে না—আমারই বুকের ওপর বসে আমারই দাড়ি ছিঁড়বে না!'

'না-না, ছি-ছি'—কুণ্ঠিত কাতর মুখে বললে তারাপদ। 'যদি চাকরি পাই, তবে কেন আর অমন দুর্মতি হবে, বলুন?'

'তাই তোমাকেই দিচ্ছি, চাকরিটা। সৎপথে ভদ্রলোকের মতো যাতে থাকতে পারো, তারি জন্যে। তা ছাড়া, তোমাকে যেন সেদিন অনেক বেশি মেরেছিলাম—তাই না?'

লজ্জা ও কৃতজ্ঞতায় তারাপদ অধোমুখ হয়ে রইলো।

তেমন কারণ যেন আর না ঘটে। যাও, কাল থেকেই কাজে এসো। আপাতত ষোলো টাকা মাইনে দেবো। বুঝলে?

সত্যি, তারাপদ বুঝতে পারেনি প্রথমটা। চাকরি, আশ্রয়, মাইনে, খাবার সংস্থান, সর্বোপরি জীবনে এই প্রথম মর্যাদা বোধ—সব মিলে তার কাছে একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্ন বলে মনে হলো। অন্ধকার পথে যেন বাতি জ্বলে উঠলো, জেলের দেয়াল ভেঙে যেন মুক্তির হাওয়া বইতে লাগলো।

চতুর ও চটপটে—দু-দিনেই মনিবকে খুশি করে ফেললে তারাপদ। কোথায়, কোন্ তাকে কোন্ জিনিস আছে, দু-দিনেই তার মুখস্ত হয়ে গেলো। সমস্ত জিনিসের দাম তার জিহ্বাগ্রে। একদিনের বেশি দু-দিন তাকে ঠেকতে হলো না, জিজ্ঞেস করতে হলো না, হাওয়ার মুখে পালের মতো সে চালিয়ে নিলে। এতদিনের পুরোনো কর্মচারী যে বিভূতি, সে বরং মাঝে মাঝে দামের জন্যে—আম্‌তা আম্‌তা করে, কিন্তু তারাপদ ঠিক ঠিক বলে দেয়।

কিন্তু কেন কে জানে। এত বেশি কৃতিত্ব শ্যামাকান্তের পছন্দ হলো না। একটু বেরঙা বা সাদাসিধে হলেই যেন ভালো লাগতো। সব কথায় একটু দোমনা-দোমনা ভাব করবে, একটু বোকাটে-বোকাটে ভাবে তাকাবে, ধমক খাবার মতো জায়গা রাখবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে—তা হলেই ঠিক মানাতো তাকে, কিন্তু তারাপদর কাজ একেবারে নিখুঁত। শুধু তাই নয়, তাহলেও কিছু আসতো-যেতো না—দোকানের কর্মচারীর পক্ষে সে অনেক বেশী তুখোড়, পাকা বুদ্ধিমান—বিভূতির চেয়ে তো বটেই, হয় তো শ্যামাকান্তরও চেয়ে।

তাই বাঁকা চোখে মাঝে মাঝে দেখতে হয় শ্যামাকান্তকে। যখন জিনিসপত্র তারাপদ নামায় ও তুলে রাখে, তখন তো বটেই, যখন ক্যাশমেমো লিখে খদ্দেরের থেকে পয়সা গুণে নেয়, তখনো। দোকানে আগে ক্যাশমেমো থাকলেও তার কার্বণ-কপি রাখবার রেওয়াজ ছিলো না। তারাপদ আসবার পর থেকে সেটা চালু হয়েছে, চার পয়সার ওপরে হলেই ক্যাশমেমো। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলেই যে এটার প্রবর্তন হলো, বুঝতে পারেনি তারাপদ, বরং বিক্রীর বুনিয়াদটা পাকা হলো বলে সে এটা সমর্থন করলে। শ্যামাকান্ত যখন বাজারে বেরোয়, ক্যাশের চার্জ দিয়ে যায় বিভূতিকে। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলেই যে ক্যাশ তাকে ছুঁতে দিচ্ছে না, বুঝতে পারেনি তারাপদ, বরং বিভূতি তার চেয়ে পুরোনো এবং বয়সে বড়ো বলে এটাই যে

সমীচীন, তাতে আর তার সন্দেহ নেই। তবুও সুশৃঙ্খল হলেও মধ্যে মধ্যে কেমন যেন সে অনুভব করে, শ্যামাকান্তর চোখের দৃষ্টিটা যেন কুটিল, মুখের ভাবটা মৃত, আর ব্যবহারটা নিরুত্তাপ। অথচ তার কাজে কোথায় কী ত্রুটি হতে পারে, ভাবতেই পারে না সে।

যত সে চৌকস হতে যায়, ততই যেন শ্যামাকান্তর মন ঘুলিয়ে ওঠে সন্দেহে। নিশ্চয়ই কোনো ফেরেবি মতলব আছে। দাগী—বলা যায় না। আরো কড়া পাহারা দরকার।

একদিন তাই শ্যামাকান্ত খোলাখুলি বলে ফেললে বিভূতিকে। বললে, 'আমি তো সব সময়ে দোকানে থাকি না, তুমি এবার থেকে একটু নজর রেখো ওর ওপরে। স্টক কিছু না সরায়, এই শুধু ভাবি। তুমি একটু হুঁশিয়ার থেকো, বুঝলে?' তারাপদকে বিভূতি নতুন চোখে দেখলে, শ্যামাকান্তরই মতো চাউনিটা ঈষৎ বাঁকা করে। তারাপদ দেখলো, বিভূতিরও হাবেভাবে আকস্মিক অরুচি।

সেদিন বাজারে গিয়েছিলো শ্যামাকান্ত, বিভূতি ছিলো ক্যাশের চার্জে। রাতে দোকান বন্ধ করবার আগে ক্যাশ মেলাতে গিয়ে শ্যামাকান্ত দেখলো, বেশী নয়, দশ আনা পয়সার ঘাটতি। তলব পড়লো বিভূতির।

প্রথমটা বিভূতি হতভম্বের মতো মুখ করে রইলো। পরে কারণ খুঁজে পেয়েছে, এমনি উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'মাঝখানে আমি একবার মেসে গিয়েছিলাম আধঘণ্টার জন্যে। তখন ক্যাস ছিলো তারাপদর জিম্মায়, তখন—সেই ফাঁকে—'

কথাটা তার শেষ হতে পেলো না। শ্যামাকান্ত গর্জে উঠলো, 'সেই ফাঁকে তুমি সমস্ত দোষটা তারাপদর ঘাড়ে চাপিয়ে দাও আর কি! মজা মন্দ নয়! ভালো সুবিধে পেয়ে গেছো দেখছি। এ কারসাজি চলবে না—বলে দিলুম, সাবধান।'

শ্যামাকান্ত ঘটনাটার ওপর এমন মোড় নেবে, বিভূতি ধারনাই

করতে পারেনি, তাই সে থতমত খেয়ে গেলো। তবু বললে, 'আমাদের দু-জনের মধ্যে—'

'কাকে বেশী সন্দেহ করছি, তা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। যেহেতু তুমি চার্জে ছিলে—তোমাকেই দায়ী করবো। তোমার মাইনে থেকে কেটে নেবো, দশ আনা।'

বেশী দূরে ছিলো না তারাপদ। সমস্তই সে শুনলে স্বকর্ণে, দেখলে চোখের ওপর। বুঝলো, সে যে চোর, বিভূতির তা অজানা নয়; সে যে চোর শ্যামাকান্ত তা ভুলতে পারেনি। আইনের কাছে তার অপরাধের চরম মার্জনা ঘটলেও মানুষের কাছে ঘটছে না। পুলিশ তাকে পথ ছেড়ে দিলেও মানুষ চোর বলে তার পথ আটকাচ্ছে। রাজার বিচারে দোষমুক্ত হয়েও প্রজার বিচারে সে আজো দোষী। বিভূতির মাইনে কাটা গেলেও মাথাটা যেন কাটা যাওয়া উচিত ছিলো তারাপদর—শ্যামাকান্তর এমনি মুখের চেহারা। তারাপদর বিরস লাগতে লাগলো সমস্ত। যখনই শ্যামাকান্তর দিকে তাকায়, শ্যামাকান্তর উদ্ধত দৃষ্টির সঙ্গে কঠিন সংঘর্ষ হয়। মনে হয়, শ্যামাকান্তও দেখছিলো তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে। সব সময়েই একটা কুৎসিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাকে ঘিরে থাকে রাহুর গ্রাসের মতো। কোনো জিনিস যখন সে নামায়, যখন প্যাক করে, যখন দাম নেয়, যখন চেঞ্জ দেয়—সব সময়। যখন কোনো খদ্দের নেই, চুপ করে সে বসে কিম্বা দাঁড়িয়ে আছে, তখনো। অথচ চাকরিটা ছেড়ে দেবে এমন তার সঙ্গতি নেই। চাকরিটা ছেড়ে দেবারই বা বাস্তবিক কারণ কি?

সেদিন তারাপদর চেনা এক লোক এসেছিলো বিয়ের সওদা করতে। তারাপদ কাজ করে, তাই এ দোকানে আসা। টাকা পঞ্চাশের জিনিস। প্যাকেট বেঁধে লোকের হাতে দিচ্ছে, শ্যামাকান্ত বললে তারাপদকে, 'খোলো, আমি একবার দেখবো। ভুলে দু-এক পদ বেশী গেছে কিনা—' 'আমি ক্যাশমেমোর সঙ্গে দু-বার করে মিলিয়ে

নিয়েছি।' বলা যায় না। সেদিনও বিয়ের উপহার কিনবে বলেই তুমি এসেছিলে—'সেই বইএর দোকানে।'

মুখ চোখ গরম হয়ে উঠলো তারাপদর। কিনতে এসেছিলো যে লোক, পূর্ণকাহিনী সে জানতো না কিছুই; কিন্তু তারাপদর মনে হলো পৃথিবীর কারুর কাছে তার সেই কলঙ্ক আর অকথিত নেই। তার দিকে সকলেরই দৃষ্টি যেন কেমন ঘৃণার, একটু বা অনুকম্পার।

জিনিস ঠিকঠাকই আছে, দামও বেশী ছাড়া কম নয়, যোগ নির্ভুল—তবু সাবধানের মার নেই। তারাপদ নতুন করে প্যাকেট বাঁধলো। সেদিন শ্যামাকান্ত বললে, 'দেখ, চার পয়সা পর্যন্ত দামের জিনিস তুমি বেচতে পাবে না। বিভূতি বেচবে।'

তারাপদ বুঝতে পারলো মর্মার্থ।

অর্থাৎ যে জিনিসে ক্যাশমেমো দেবার নিয়ম নেই; —যেমন নস্যি, লজেঞ্চুষ, নিব, পেন্সিল—অনেক কিছুই হতে পারে—সে-সব জিনিস বিক্রি করা তারাপদর বারণ হয়ে গেলো।

'আমি কি'—কী বলবে বুঝতে পারলো না তারাপদ।

'হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, কম দামের জিনিসে ক্যাশমেমোর কড়াকড়ি নেই বলে তুমি বড্ড হাত খোলা হয়েছো। সেদিন দেখলুম, দু-পয়সায় এক খাবলা নস্যি দিলে, প্রায় দু-আনার মাল। আরো একদিন দেখেছি, চার পয়সার লজেন্স হবে ষোলোটা, তুমি দিলে প্রায় ডবল। ওসব লোক তোমার সঙ্গে আগে থাকতে ষড় করে এসেছে কিনা, তুমিই জানো।'

'সামান্য জিনিস—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সামান্য থেকেই অসামান্য হয়ে ওঠে। মুখে মুখে তর্ক করো না। সন্দেহ করবার কারণ ঘটেছে বলেই সন্দেহ করছি। নইলে অত ছোটো নজর আমার নেই। থাকলে চাকরি দিতুম না তোমাকে, বুঝলে?'

তারাপদ চুপ করে গেলো। সন্দেহ করবার কি কারণ জানতে চাইলো না। সেদিন ব্যাপার উঠলো চরমে। দোকান বন্ধ করে সবাই বাড়ি ফিরছে, শ্যামাকান্ত হঠাৎ তারাপদকে বললে, 'তোমার পকেটে দেশলাই আছে?'

বলে তারাপদকে খোঁজবার অবকাশ না দিয়ে নিজেই তার পকেট হাটকাতে লাগলো। এমন কি বুক পকেট পর্যন্ত। ট্যাকে অবধি হাত দিলো। হকচকিয়ে গেলো তারাপদ—এমন রূঢ় আর অপমানকর ব্যবহার! শ্যামাকান্ত যে দেশলাই খুঁজছে না, তা বুঝতে তার বাকি নেই। বাড়ি যাবার আগে দোকান থেকে মাল সে কিছু সরায় কি না, এ শুধু তারই পরীক্ষা। কেন না বিভূতি তার নিজের পকেট থেকে দেশলাই বের করে দিলেও শ্যামাকান্ত তা নিলে না হাত বাড়িয়ে। মনে হলো, তারাপদর সাধুতায় সে যেন হতাশ হয়েছে। যখন তখন আকস্মিকভাবে শ্যামাকান্ত স্টক মেলায়। সাধারণতঃ কিছু পায় না গরমিল, কিন্তু সেদিন পেলো—নারকোল তেল একটা কম।

গর্জন করে উঠলো—'বিভূতি!'

বলা বাহুল্য, বিভূতি দোষ চাপিয়ে দিতে গেলো তারাপদর কাঁধে।

'খবর্দার, মিথ্যে কথা বলো না। ছাই ফেলতে তুমি চমৎকার ভাঙাকুলো পেয়েছো দেখছি!'

'আমাকে যদি সন্দেহ করেন, তবে ছাড়িয়ে দিন!'

'প্রমাণ পাবার আগে কাউকে আমি ছাড়বো না। যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তখন ওটার দাম তোমাদের দু-জনেরই মাইনে থেকে সমান সমান কাটা যাবে।'

তারাপদকে শুনিয়ে বিভূতি বললে, 'চোর নিয়ে বাস করে আমার যে কী মুস্কিল হলো! এতদিন তো বেশ ছিলাম—'

তারাপদ বললে, 'এতদিন যে মাছ ঢাকবার জন্যে শাক ছিলো না।' সময় হয়েছে, বিভূতির মাইনে বাড়লো দু-টাকা।

বিভূতি বললে তারাপদকে, 'না বাড়ালে চলে কি করে? তোমার কৃতকার্যের জন্যে আমি আর কত গুনোগার দিতে পারি?'

কথাটা ভীষণ বাজলো তারাপদর, কিন্তু নিরুপায়, বাইরের বেকার জীবন সে জেনে এসেছে। চাকরিতে তাই তাকে টিকে থাকতে হবে। কিন্তু সে যে একদিন চুরি করেছিলো, এ কথা ভুলবে না এরা; তাকেও ভুলতে দেবে না?

যখন তখন—মাঝে মাঝে প্রায়ই শ্যামাকান্ত আর বিভূতি নিভৃতে বসে বসে গুজ গুজ করে, তারাপদকে নিয়েই নিশ্চয়ই। যে কেউ খদ্দের আসে, ওকেই যেন তারা গোপনে ডেকে চিনিয়ে দেয়। চোর—চোর—ঘরের সমস্ত জিনিস যেন তাকে সঙ্কেত করে চোর বলে। পয়সা যখন সে নেয় খদ্দেরের হাত থেকে, মনে হয়, সেটা ক্যাশে না দিয়ে অজানতে নিজের পকেটে ফেলবে; ফিরতি যখন সে দেয়, মনে হয়, কিছুটা যেন সে হাত সাফাই করে সরিয়ে রাখবে চুপি চুপি। রাস্তায় যখন সে চলে, তার পিছনে পায়ের শব্দ শুনে সে মনে করে, তাকে অনেকে মিলে ধরতে আসছে। রাতে যখন সে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে, মনে হয়, সে চুরি করতে ঢুকেছে। ঘুমের মধ্যে চুরির স্বপ্ন দেখে তারাপদ। গামছা দিয়ে নিজেই নিজের দু-হাত বেশ করে কষে বাঁধে, ভাবে—চোর!

সেদিনও শ্যামাকান্ত গিয়েছিলো বাজারে, বিভূতি ছিলো ক্যাশের চার্জে। সেদিনও বিভূতি মাঝখানে উঠে গেলো তার মেসে, ক্যাশের ভার তারাপদকে হস্তান্তর করে। বিভূতি এবার দশ আনার জায়গায় দশ টাকা সরিয়েছে, কিন্তু গুণে দেখলো—নোটে টাকায় মিলে এখনো আটানব্বুই টাকা আছে।

বিভূতি ফিরে এসে দেখলো—দোকানে তারাপদ নেই, ক্যাশবাক্সও উধাও। ধর—ধর রব পড়ে গেলো, আর তারাপদ ধরা পড়লো দিন সাতেক পরে, যশোরের এক গণ্ডগ্রামে।

এবার আর হাতের সুখ হলো না শ্যামাকান্তর। শুধু একটা সঘৃণ কটাক্ষ করে বললে, 'এত উপকারের বিনিময়ে এই প্রতিদান!'

কান্নার ভেতর থেকে বললে তারাপদ, 'কেন তবে ভুলতে দিলেন না আমাকে যে, আমি একদিন চুরি করেছিলাম? কেন সব সময়ে সন্দেহ করে করে আমাকে প্রস্তুত করে রাখলেন যে, আমি চোর, যেকোন মুহূর্তে আমি চুরি করতে পারি? কেন বিশ্বাস করলেন না আমাকে? বিশ্বাসের আলোয় কেন আমার অতীত কলঙ্ক মুছে দিলেন না, আপনি?'

উৎফুল্ল হয়ে খবর নিয়ে এলো বিভূতি, তারাপদর এবার তিন বছর জেল হয়েছে।

শ্যামাকান্ত বললে, 'তোমাকে জেল দিতে পারবো না বটে, কিন্তু একটি শেল দেবো। ইংরেজি, বাংলা—যে শেল তোমার পছন্দ।'

বিভূতি শূন্যে হাতড়াতে লাগলো।

'এক কথায় আজ এইখানে তোমার চাকরিও খতম হলো। এই মুহূর্তে, বিনা নোটিশে। এই ক'দিনের মাইনে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

গাল চুলকোতে চুলকোতে বিভূতি বললে, 'অপরাধ?'

'অপরাধ, তোমারই সঙ্গদোষে তারাপদ আবার চোর হলো।'

'আমারই সঙ্গদোষে? আমিই বরং চোরের সঙ্গে থেকে থেকে প্রায় চোর বনে যাচ্ছিলাম।'

'না, তোমার একার দোষ নয়। আমিও ছিলুম তোমার পাশে পাশে। "ও চোর, ও চোর", এই কথা সর্বক্ষণ বলে বলে আমরা ওকে বুঝিয়েছি, চোর ছাড়া ও আর কেউ নয়। ঠেলে ঠেলে শেষকালে ওকে আমরা ফেলে দিলুম সেই গহ্বরে। আমি প্রকাশক থেকে মনিহারি হলুম, তুমি হয়তো সেলসম্যান থেকে মিনিস্টার হবে, কিন্তু তারাপদ আজও চোর, কালও চোর।

'তোমার শাস্তি তুমি আমার হাত থেকে নাও, আর আমার শাস্তি স্বয়ং বিধাতার হাতে শীগ্‌গিরই তৈরি হচ্ছে।'

পরেশ যেদিন জন্ম নিলে সেদিন ছিলো ভারী বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি যেন ওর সারা জীবনে আর থামলো না। ছিঁচকাঁদুনে আকাশই হলো পরেশের সারা জীবনের সাথী।

পরেশের জীবনে কোনো দিন রোদ ওঠেনি—আজ সর্দি, কাল জ্বর, পরশু ব্রঙ্কাইটিশ্। অসুখ ওর লেগেই আছে। ওর শৈশবকাল ওর কাছে ঘোলাটে, একান্ত তেতো হয়ে উঠেছে।

চেহারা দেখলে মনে হয় একটা বিরাট কেঁচো অতিকষ্টে যেন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওর ওজন বোধহয় একটা প্রজাপতির চেয়ে বেশি হবেনা। গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে। মাথায় চুল নেই। একটা ঠ্যাং আবার একটু খুঁড়িয়ে চলে। পৃথিবীতে যে জনসমুদ্র ছলে উঠছে, ও যেন তার একটা ক্ষণস্থায়ী ফেনা। ও একেবারে পল্‌কা, এক্ষুনি যেন মচকে ভেঙে যাবে! বাতাসের ফুঁয়ের কাছে ঝরাপাতার মতো দুর্বল।

বছরে তিনশো ষাট দিনই ওকে বিছানা নিতে হয়। তাই ইস্কুল ওর নাগালের বাইরে। সমস্ত দিনই ওর রবিবার—কিন্তু রবিহীন ওর দিনগুলি সব সময়েই স্যাঁৎসেঁতে। পচা ভাদ্রের মতো এঁদো, মেঘলা। ওর বারো বছরের দিনগুলি ঘিরে খালি শীতের কুয়াশা। ওর নিঃশ্বাসের জন্যে বাতাস অল্প। একটা কান-ঢাকা টুপির মতো আকাশ যেন ওকে চেপে রেখেছে, একটা গরম অলেষ্টারের মতো ছোটো ঘরটা জানালা-দুয়ার বন্ধ করে ওকে একেবারে আটকে রেখেছে—ওর মুক্তি নেই। রোগশয্যায় বন্দী এই পরেশ।

শহরের সেরা ডাক্তার থেকে হাতুড়ে, সবাই পরেশের না-ছোড়-বান্দা হিতৈষী। ওষুধ খেয়ে খেয়ে পরেশের জিভ্ কালো হয়ে গেছে —কুইনিনই ওর খাদ্য। ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাকটেট্ই ওর প্রধান

ভিটামিন। এই বারো বছর পরেশ সমানে ওষুধ গিলে আসছে, দুই বাহু ওর ইনজেকশনের খোঁচায় জর্জরিত, রোগের দাসত্ব করে করে ওর মেরুদণ্ড গেছে বেঁকে—ওর সমবয়সীরা সবাই সোজা, সরল ; ও একটা কুঁজো শামুক বৈ কিছু নয়।

ওর গলায় প্রকাণ্ড একটা 'না'-র বখলস্ ঝুলানো। যা-ই ও করতে চায়, সবতাতেই অভিভাবকেরা হুমকি দিয়ে ওঠেন—'না।'

—জানলাটা খুলি ?—না, ঠাণ্ডা লাগবে।

—একটু পড়ি ?—না, মাথা ধরবে।

—একবার রাস্তায় যাই ?—না, গাড়ী চাপা পড়বে।

এই বারো বছর ধরে পরেশ কোনোদিন টক্ খায়নি, নারকোল খায়নি, বাজারের কোনো জিনিসই না—কাশি বাড়বে, পাকস্থলী মোচড় দিয়ে উঠবে। এই বারো বছর ধরে পরেশ একটানা রোগের দাসত্ব করে আসছে ; আর সংসারে অভিভাবকেরও শেষ নেই। ওর তেরো বছরের দিদি পর্যন্ত ওর ওপর তম্বি করতে আসে, বাঁধন একটু আল্‌গা হলেই আসে রুখে। ওকে রোগের কারাগারে কয়েদ করে রাখাই সবার কাজ। পরেশ হাঁপিয়ে ওঠে। এরকম করে মোচড় দিয়ে দম দিয়ে দিয়ে ঘড়ি চালিয়ে কি লাভ ?

সন্ধ্যা হতে না হতেই পরেশের জামা পরার কুস্তি শুরু হয়। —পায়ে মোজা, গায়ে ফ্লানেলের শার্ট (বৃষ্টি হলে গরম কোট, ওপেন-ব্রেষ্ট নয়) গলায় কম্ফার্টার, মাথায় কান-ঢাকা টুপি এবং সবশেষে আলোয়ান। কাল-টা যদি শীত হয় তবে জামাগুলি সাপের খোলসের মতো বেড়ে যেতে থাকে। জামার জঙ্গলের মধ্যে বন্দী হয়ে পরেশ জড়ভরতের মতো বসে বসে আগামী দুপুরবেলার জন্যে প্রতীক্ষা করে, দুপুরবেলাই জামার সঙ্গে ওর কয়েক ঘণ্টার জন্যে বনিবনা থাকেনা বলে, দুপুরটাই ওর যা একটু ভালো লাগে। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটা সকলের মাঝে, যার ভেতরে বেশী আলো আসে না।

বাতাস আসেনা, সেই ঘরেই পরেশের রোগশয্যা। এই ঘরে যদি ও মরে, তবে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দেওয়ালে ওর ক'বার যে মাথা ঠুকে যাবে তার হিসেব চলেনা! ওর ওপর সবার কড়া পাহারা। মশা মারতে সবাই কামান দেগেছে।

পরেশের হাতে কোনই কাজ নেই; তাই দুপুরবেলা রাস্তার ধারের ঘরটিতে বসে খোলা জানালা দিয়ে ও পথের সঙ্গে বন্ধুতা পাতায়। ভারি ভালো লাগে ওর এই পথ আর পথিক দেখতে। মনে হয়, সবাই চলেছে, কেউ ওর মতো ঘরে বসে নেই—পথও বিবাগী হয়ে উধাও হয়ে কোথা দিয়ে যে কোথায় হারিয়ে গেছে, পরেশ ঠাহর করতে পারে না। ট্রাম বাস ট্যাক্সী—সবাই পাল্লা দিয়ে চলেছে, জিরোবার কারো সময় নেই, জিরোতে গেলেই আর সবাই পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, তাই সবাই দে-দৌড়। আকাশের পাখী, মেঘের পান্সী, চিমনির ধোঁয়া—সবাই উড়ে চলেছে। আমাদের এই যে পৃথিবী, সেও লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে নেই, লাট্টুর মতো দিবারাত্রি ঘুরছে। ছুটে চলেছে সময়ের সমুদ্র;—খালি পরেশই বসে বোকার মতো, বোবার মতো; পরেশই খালি সবার সঙ্গে পা মেলাতে পারছে না।

একদিন পরেশদের রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে লটারি-লজেনচুষওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিলো। একটা গোল পিসবোর্ডের ঘড়ি, তাতে কাঁটা ঘুরিয়ে দিলে যে ঘরে কাঁটা এসে থামবে সেই ঘরের নম্বর যা, ততোগুলি লজেন্স পাওয়া যায়—এক পয়সায়। এক থেকে এক চল্লিশ পর্যন্ত আছে। পরেশ গেলো তাই কিনতে।

দু-একবার বেশি পেলো না। তিন বারের বার কাঁটা একেবারে একচল্লিশের কোঠায় গিয়ে উঠলো। পরেশ উঠলো লাফিয়ে, কিন্তু লজেনচুষওয়ালা বললে কাঁটা লাইনে আছে, আবার ঘোরাও।

'মিথ্যে কথা!'

কিন্তু পরেশের প্রতিবাদে জোর নেই, বিবাদে ওর ঘুষির জোর নেই বলে, পরেশের ক্ষীণ আপত্তিতে ফিরিওয়ালা কান দিলে না। পরেশ গেলো লজেন্সের ঠোঙা কাড়তে, লোকটা মারলে এক ধাক্কা—রোগা পরেশ ছিটকে পড়ে কেঁদে উঠলো।

তারপর বাড়ির বকুনি আর বকুনি।

বাবা বললেন, 'রোগা না হলে এমন মারতাম!'

পরেশ ভাবলে—রোগা না হলে ঐ ফিরিওয়ালাটাই আজ আস্ত থাকতো কিনা!

পরেশের কারাগারের দেয়াল আরো উঁচু হয়ে উঠলো। অপমানে দুঃখে একেবারে এতটুকু হয়ে গেলো—এমনি করে বেঁচে থেকে কি লাভ? লোকের করুণা আর অপমান কুড়িয়ে ও বাঁচতে চায় না, নিজেকেই ও নিজে ছি-ছি করে।

পরেশদের পাড়ায় এক সার্কাস পার্টি এসেছে। অনেক কষ্টে পরেশ তার বাবাকে রাজি করালে ওকে নিয়ে যেতে হবে। জামা জুতো পরে সাতাশ সের পরেশ একমণ হয়ে উঠলো। গিরগিটি রাতারাতি ভাল্লুক হয়ে গেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! মানুষের বুকের ওপর হাতী ওঠে। কোমরে দড়ি বেঁধে চলন্ত মোটর গাড়ীকে দাঁড় করিয়ে রাখে! এও সম্ভব? —ভয়ে ও বিস্ময়ে পরেশের বুক দুলতে লাগলো। ওকে যদি হাতীর পায়ের তলায় শুইয়ে দেয়, তাহলে হয়তো ওকে মাটি থেকে আর আলাদা করা যাবে না। পরেশ এ কি দেখলো! মাথার চুলের সঙ্গে পাথর বেঁধে তারাবাঈ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে! আর পরেশ একটা ঢিল ছুঁড়তে পর্যন্ত পারে না।

মানুষের এই কীর্তি দেখে এসে পরেশের আবার আশা হলো। মানুষই এই শহর বানিয়েছে, মাইলের পর মাইল রেল লাইন পেতেছে, মানুষই ঝরণা থেকে বিদ্যুৎ বার করেছে, আলপস্ পাহাড় ডিঙিয়েছে,

এভারেস্টের মাথায় উঠেছে। মানুষ কী না করেছে? গরম জলের কেটলি দেখে এঞ্জিন বানিয়ে ফেললে। কামান দেগে দেশ উড়িয়ে দিলো—সমুদ্রকে পর্যন্ত আটকে রাখলে!

পরেশের মধ্যেও সেই মানুষের রক্ত আছে; যে মানুষ আদিম জঙ্গল কেটে শহর পেতেছে, নগর গড়েছে—পরেশ তাদেরই বংশধর। পরেশের ইচ্ছা করে, এই খোলস ছুঁড়ে ফেলে একেবারে মানুষ হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে তাজা রক্ত টগবগ করে উঠুক—ও এমনি করে অলি-গলি দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় না, ও সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়, তার সঙ্গে পাঞ্জা কষে, তার কব্জি গুঁড়ো করে দিতে চায়। পরেশ সহজে তাকে ছেড়ে দেবে না।

পরেশ দুখানা ইট দিয়ে ডাম্বেল বানিয়ে ফেললে। দুপুরবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে ও তাই নাড়াচাড়া করে—আর বারেবারে আয়নায় নিজের মুখ দেখে আর ভাবে, বুঝি লাবণ্য লালিমা এসেছে, দুই চোখে বুঝি একটি হাসির আভা, বাহু দুটো বুঝি আধ ইঞ্চি মোটা হলো। বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরেশ খালি নিজের চেহারা দেখে আর চেহারাটা আরো একটু তাজা হয়েছে—খালি এই স্বপ্ন দেখে। ও ওর দুটো ইটের ডাম্বেল উঁচিয়ে যেন মৃত্যুকে ভয় দেখায়।

এখন, এই পরেশের কাজ—নিজের শরীর একটু একটু করে শুধ্‌রে উঠছে—শুধু এই ইচ্ছাটিই যেন ওর পা থেকে বাহু পর্যন্ত তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। আজ ওর পাঁজর বের করা বুকটা না হয় একেবারে জীর্ণ, কিন্তু এই বুকের ওপরেই ও হাতী নেবে। যেমন করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ছারপোকা মারে; তেমনি করে পৃথিবীর সমস্ত রোগের অদৃশ্য জীবাণু ও পিষে পিষে মারবে। কুস্তিতে মৃত্যুকে নাস্তানাবুদ না করলেই নয়। পরেশ মনে মনে ক্ষেপে গেছে। এই মনের জোর পরেশের মহৌষধি।

বাবা একদিন টের পেয়ে পরেশের ইটের ডাম্বেল ভেঙে ফেললেন। কতকগুলি বকুনি ও তেতো ওষুধ খেয়ে পরেশকে আবার প্রলেপ ও লেপের তলায় বন্দী হতে হলো। কিন্তু দুপুরবেলায় বাড়ি যখন নিঝুম, পরেশ মা'র বাক্স থেকে কতকগুলি টাকা সরিয়ে ট্রামে করে সটান একেবারে কার্ণাবিশের দোকানে এসে হাজির হলো। গ্রিপ ডেভ্‌লপার কিনে এনে আবার গুটি গুটি লেপের তলায় গিয়ে লুপ্ত হলো। ওদের বাড়ীতে এক লেপচু চাকর ছিলো, ছোঁড়াটাকে দোর-গোড়ায় বসিয়ে রেখে পরেশ লেপ থেকে বেরিয়ে এসে ওর যন্ত্রপাতি নিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে; চাকরটা 'পরু বাবু' বলে আওয়াজ করলেই পরেশ নিরীহ অথচ বিরক্ত হয়ে আবার লেপের নীচে রোগের ডাষ্টবীনে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

পরেশকে রুগ্ন দেখাই এ বাড়ীর অভ্যাস। পরেশ যদি লেপ কম্বল ছেড়ে সোজা তলোয়ারের মতো ঝক্‌ঝকিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, সবার মনে হবে মেঘের বালিশ ছেড়ে সূর্য যেন মাটির ওপর এসে দাঁড়িয়েছে—সেই প্রখরতা ওরা সইতে পারবে না। তাই ওরা বারে বারে পরেশকে মশারির নীচে লেপের তলায় ঠেলে দিয়েছে।

কিন্তু পরেশ বেরিয়ে আসতে চায়, যেমন স্ফটিক স্তম্ভ বিদীর্ণ করে নৃসিংহ বেরিয়ে এসেছিলেন। পৃথিবীতে ও আর কিছুই চায় না—খালি বাঁচতে চায়, নিবিড়—গভীর করে বাঁচতে চায়। হাঁ করে শুধু নিঃশ্বাস নেবার মতো বাঁচা নয়—একটা ইঞ্জিনের মতো বাঁচা; ও দু-দিন পরে বন্ধ হয়ে যাবে তাও স্বীকার, তবু একবার বিসুভিয়াসের মতো আগুন উদ্‌গীরণ করে যাবে। দুই চোখে ও আকাশের নীল সমুদ্র দোলাবে, দুই বাহুতে ও বিধাতার বৃহৎ সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করবে। প্রত্যেকটি মুহূর্তকে ও স্নেহ সম্ভাষণ করবে। ও ওর মাসতুতো দাদার কাছে কতদিন শুনেছে, খালি বয়স কুড়িয়ে বুড়িয়ে গিয়েই মানুষ বড়ো হয় না—বাঁচার মতো বাঁচতে পারলেই বড়ো হওয়া

যায়। শুনেছে, ইংরেজদের মহাকবি শেলী নাকি মোটে ত্রিশ বছর বয়সে লক্ষ্মী আবিষ্কার করতে সমুদ্রে ডুবেছিলো—আর ওঠেনি। মহাযোদ্ধা নেপোলিয়ানের আয়ু কতটুকু—বিবেকানন্দের? ত্যাগী দেশবন্ধুর সত্যিকারের আয়ু তো মোটে পাঁচ বছরও নয়। গত জার্মানযুদ্ধে রুপার্ট ব্রুক্ নামে যে যুবক ইংরেজ কবি দেশের জন্যে প্রাণ দিলো, সে তো আঠাশের কোঠাও পেরোয়নি! পরেশ যদি জোয়ান হয়ে মজবুত হয়ে তার পরাধীন দেশের জন্যে মহৎ কাজে আত্মবলি দিতে পারে, তা হলেও ও ধন্য।

লেপচু চাকরটা পাহারা দেয় আর পরেশ হাত-পা ছড়িয়ে বুক মেলে দিয়ে ব্যায়াম করে, ব্যায়ামের শেষে ফিতে দিয়ে মাসল্ মাপে,—একটু একটু করে ও ভালো হচ্ছে ভেবে মনকে উৎসাহিত করে। দেখতে দেখতে ওর ঘুস্‌ঘুসে জ্বর ওর শ্রমের ঘামে মুছে গেলো,—লেপচু চাকরটা কথার অবাধ্য হলে ওর গালে ঠাস করে চড় মারবার মতো পাঁচ আঙুলে ওর শক্তি এসেছে, ওর বাঁকা মেরুদণ্ড লোহার শিকের মতো দিনে দিনে টন্‌কা হয়ে উঠলো।

কিন্তু বাবা আবার আরেক দিন টের পেলেন। সেদিন পরেশের পিঠে বেদম প্রহার পড়লো—সমস্ত যন্ত্রপাতি ডাষ্টবীনে ছুঁড়ে ফেলা হলো। পরেশ কাঁদলে বটে, কিন্তু এতগুলো মার সহ্য করবার মতো শক্তি ওর এসেছে বলে ওর গর্বের আর শেষ রইলো না।

বাবা বললেন, 'এসব বাড়াবাড়ি করলে ফুসফুস যে ফেঁসে যাবে তোমার।' কিন্তু রোগের ফাঁস গলায় জড়িয়ে ও আত্মহত্যা করতে চায় না। পরেশ একদিন চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মাকে চিঠি লিখে গেলো:

'মা, আমি মজুর হয়ে রাস্তা খুঁড়বো তাও ভালো, তবুও সমস্ত জীবন রোগের হাত ধরে খুঁড়িয়ে চলতে পারবো না। মনে করো, আমি মরে গেছি। আমি চললাম; হয় সার্কাসের ডন-বীর, নয়

জাহাজের খালাসী ; হয় কারখানার কুলি, নয় তো রিকসাওয়ালা হবো। প্রণাম নিও। ইতি—তোমার পরেশ।'

বারো বছরের ছেলে পরেশ সোজা একেবারে গোয়াবাগানের কুস্তির আখড়ায় এসে হাজির হলো। ওর নিশ্চয়ই গামাকে হারিয়ে দেওয়া চাই, মল্লবীর টুনি হিনি ওর পায়ের তলায় পড়ে থাকবে। যুযুৎসুর প্যাঁচে ও সমস্ত জাপানকে কাবু করে দেবে।

বছর ঘোরে পরেশ বাড়ীতে নেই। কত খোঁজ, কিছুতেই কিছু না—পরেশের বাবা-মা পাগল হয়ে উঠলেন। পরেশের শূন্য ঘরটি ওর মা-বাবার হৃদয়ের মতোই খাঁ-খাঁ করে! সেই লেপ, সেই সোয়েটার, সেই দস্তানা—সেই স্মৃতিচিহ্নগুলো নিয়েই ওঁরা চোখের জল ফেলেন। পরেশ কিছুই নিয়ে যায় নি, কেবলমাত্র অসুখের ক্ষতিপূরণ বাবদ আব্দার করে যে টাকাগুলো পেয়েছিলো দিনের পর দিন ; তাই ওর পাথেয়। মা-বাবার স্নেহ নয়, রোগ নয়—খালি একটি অনির্বাণ আশা। সুস্থ হবার, আয়ুষ্মান হবার—মৃত্যুর ওপর জয়ী হবার প্রতিজ্ঞা! পরেশ বাঁচবার জন্যে, পা ফেলে আর আর সবাইর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে চলবার জন্যে পথে বেরিয়েছে ; দূর ভবিষ্যৎ ওকে ডাক দিয়েছে। রাত্রির অন্ধকার সরিয়ে জ্যোতির্ময় সূর্যের মতো ও উদিত হবে। দুর্ভিক্ষের পর ও প্রচুর শ্যামলতা আনবে, অগভীর পুকুরের সীমা ছাড়িয়ে অসীম সমুদ্রের মতো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

পরেশের এক বছরের বড়ো বোনটির বিয়ে দিয়ে ওর বাবা-মা তীর্থ ভ্রমণে বেরুলেন—শান্তির আশায়! ঘরে আর নিশ্বাস কুলোয় না বলে পরেশও একদিন বেরিয়েছিলো। যদি কখনো কোথাও সন্ন্যাসী-সন্তানের সঙ্গে দেখা হয়! নিষ্ঠুর সংসারে সে কি নিষ্ঠুরের মতোই আজো বেঁচে আছে!

তীর্থ ভ্রমণের প্রোগ্রামও প্রকাণ্ড ছিলো—একেবারে হরিদ্বার। হরিদ্বারে পরেশ তো গিয়ে পৌঁছয়নি!

রাত্রি কাল। যাত্রী-গাড়িতে ভীষণ ভিড়! পরেশের মা মেয়েদের গাড়িতে না গিয়ে স্বামীর কামরাতেই ছিলেন। টিপিটিপি বৃষ্টিও হচ্ছে—বাইরের অন্ধকার যেন মৃত্যুর মতোই ভীতিজনক! একটা জাঁদরেল জোয়ান খোট্টা—সামনের ইষ্টিশান থেকে উঠেছে—জায়গা পাচ্ছেনা বলে খুব চেঁচামেচি করছে। পুরুষের গাড়ীতে মেয়ে উঠেছে বলেই লোকটার কর্কশ অভিযোগের অন্ত নেই।

পরেশের মা একটু বেশি জায়গা নিয়েই বসেছিলেন—অগত্যা লোকটা সেই জায়গাটুকু আক্রমণ করে নেহাৎ অভদ্রের মতো বসে পড়লো। পরেশের বাবা প্রতিবাদ করলেও কামরার আর কারুর সহানুভূতি না পেয়ে থেমে গেলেন।

তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই জায়গাটুকুও আর একজন অধিকার করলে। অগত্যা পরেশের মাকেও দাঁড়াতে হলো। খোট্টাটা জায়গা পেয়েও বিকৃত ভাষায় গালাগালি দেওয়া ছাড়েনি, পরেশের বাবা কিছু বললেই লোকটা আস্তিন গুটোয়! অন্য সবাই মজা দেখে হাসতে থাকে। পরেশের মা'র অপমানের আর শেষ রইলো না।

পরের ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো। কুলিরা ভিড় করে আসতে লাগলো। জানালা দিয়ে একটি কুলিকে পরেশের বাবা বললেন, 'বাবা, গার্ড কিম্বা ষ্টেশন-মাষ্টারকে একটু ডেকে দিতে পারো?'

গার্ডকে ডাকতে যাচ্ছে শুনে খোট্টাটা একেবারে তেড়ে এসে পরেশের বাবাকে মারলে এক ধাক্কা। গাড়ি তখন ফের চলতে শুরু করেছে, তাল সামলাতে না পেরে দণ্ডায়মান স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মেঝের ওপর পড়ে গেলেন, লোকগুলো হেসে উঠলো। এই দৃশ্যে সেই কুলিটি চলন্ত গাড়ির ফুট-বোর্ডে লাফিয়ে উঠে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই সোজা সেই খোট্টাটার মুখে মারলে এক ঘুষি। ঘুষির ওজন প্রায় বিরাশি সের হবে। ঘুষি খেয়ে লোকটার নাক গেলো থেঁৎলে, দাঁত গেলো ঝরে। লোকটার বয়স প্রায় তিপ্পান্ন, হাতীর বাচ্চার মতো

ভুঁড়ি—তবু সেই ষোলো বছরের কুলির সঙ্গে পেরে উঠলো না। শেষ-কালে খোট্টা-পুঙ্গব চাদরে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। তারপর উঠে দিলে শিকল টেনে। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো।

গাড়ী থামতেই পরেশের বাপ-মা চোখ বড়ো করে তাকিয়ে দেখলেন—তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পরেশ, পরনে কানি, গায়ে নীল কোর্তা, হাতে পিতলের নম্বর ঝোলানো। পরেশ তার গা থেকে জামাটা ছিঁড়ে ফেললে—দীর্ঘ প্রশস্ত বুক, মাংসের বাহুল্যে স্ফীত দুই বাহুতে ব্যাঘ্রের বিক্রম, চক্ষে দুঃসাহসের আগুন!

মা পরেশকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। খানিক আগে পরেশের ভয়ে সবার ছিলো মুখ শুকনো, এখন সবার চোখে স্নেহ কৌতূহল। পরেশ মা-বাবাকে প্রণাম করলে। সেই পরেশ—তেজী, নির্ভীক, নিষ্ঠুর, দুর্দান্ত পরেশ। শত্রুকে সে শাস্তি দিতে পারে, অপমানিতের জন্যে সে আঘাত নিতে বুক এগিয়ে দেয়। অন্যায়কে শাসন করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দ্বিধা করে না। শারীরিক পরিশ্রম করে সে গ্রাসাচ্ছাদনের আনন্দ বোধ করে।

পরেশের বাবা বললেন, 'যা জরিমানার টাকা তাই দিয়ে এবার কলকাতায় ফিরে যাই, চলো। জরিমানার টাকা যা দিতে হবে তাই আমাদের হরিদ্বারের ভাড়া।'

সন্ধ্যে হতেই কুয়াসা। স্টিমার দু-ঘন্টার ওপরে লেট। পারে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। ছাড়বার সময় কখন উৎরে গেছে। কতক্ষণ আর দাঁড়ায় ঠিক কি!

কিন্তু কি আশ্চর্য, একটাও কুলি নেই! তেমন একটা হাঁকডাক, সোরগোল পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। ব্যাপার কি?

হ্যাঁ, সিঁড়ি দিয়েছে কখন! একে একে নেমে যাচ্ছে যাত্রীরা। অথচ জেটিতে কুলির টিকি দেখা যাচ্ছে না—একটাও।

'একি, কুলি আসবে না?' রাজীববাবু প্রশ্ন করে উঠলেন।

'আসবে।' পাশ থেকে বললে কে একজন লোক: 'নিজের জিনিস হাতে করে যারা যেতে পারছে, তাদের আগে নামবার পালা। তারা নেমে গেলেই হুদ্দাড় করে এসে যাবে কুলির দল। ওদের সর্দার ওদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে গেটের কাছে।'

রাজীববাবু ভাবলেন, একটা তো স্যুটকেস আর বিছানা, নিজেই নিয়ে যাবেন নাকি হাতে করে? পরক্ষণেই ভাবলেন, আমিরি করে ফার্স্ট ক্লাসে এসে এখন কুলিগিরি করবেন, এটা ভালো দেখায় না।

'কুলি এসে পড়লেই বা কি! যা হাঁকে আজকাল ব্যাটারা!' রেলিঙ-ধরা পাশের লোকটা টিপ্পনি কাটলো।

লোকটাকে রাজীববাবুর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। কান পর্যন্ত গোঁফ, দুষমনের মতো চেহারা! যাচ্ছে তো থার্ডক্লাসে, একেবারে দাঁড়িয়েছে এসে ফার্স্ট ক্লাস ঘেঁষে। কি মতলব কে জানে?

রাজীববাবু বুকের ওপর হাত রাখলেন। না, ঠিক আছে। আপিসের জরুরি কাজে রাজীববাবু কলকাতা চলেছেন। সঙ্গে একটা সাংঘাতিক দলিল। স্বহস্তে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে এই হুকুম হয়েছে তাঁর ওপর। শার্টের বুকপকেটে দলিল। বেশি সাবধান হবার

জন্যে শার্টটা উল্টো করে পরা। তার ওপর গলাবন্ধ পুল-ওভার। তার ওপরে কোট—ওভার-কোট। শীত কিংবা চোর, কেউ ছুঁতে পারবেনা তাঁকে।

'একটু যদি দেরি করতে পারেন শস্তায় মিলে যেতে পারে দু-একজন।'—গুঁফো লোকটা আবার টিপ্পনি কাটলো।

রাজীববাবু ঘরে গেলেন।

হুদ্দাড় করে এসে পড়েছে কুলির দল।

'এই দিকে, এই দিকে।'

না বললেও আসতো প্রথমেই ফার্স্ট ক্লাসের দিকে। দরাদরির দরকার হয় না। ভারি হাতে বকশিস মেলে! 'কত নিবি?' ইণ্টারক্লাসী অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি, রাজীববাবু।

'পাঁচ সিকে।'

'এই হাল্‌কা একটা সুটকেশ আর বেডিং, পাঁচ সিকে? ডাকাতি শুরু করেছিস নাকি আজকাল? নে, চার আনা পাবি।'

'সেই সব দিন আর নেই সাহেব, এখন এক-মাথা এক টাকা।'

না, ট্রেনটা আজ আর ধরা যাবে না। যা থাকে অদৃষ্টে, বিছানা বগলে চেপে ডান হাতে সুটকেস নিয়ে নিজেই চলে যেতে পারবেন। স্বাবলম্বী হবার মতো সুখ নেই সংসারে। সেই নিজেই যদি মোট বইবেন, তবে এত দেরি করতে গেলেন কেন? প্রথম ধাক্কাতেই তো নেমে যেতে পারতেন। এত দেরি করে ফেলে এখন ফের কুলি না নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু ট্রেন ওদিকে ছাড়ে যে!

হঠাৎ কেবিনের পাশে কাতর চেহারার একটা ছেলের দিকে নজর পড়লো রাজীববাবুর। বয়স বারো-তেরো। রোগা, কঙ্কালসার চেহারা। পরনে একটা টেনি, গায়ে একটা ছেঁড়া-খোঁড়া, আঁচড়ানো-খুবলানো জামা। এতটা শীর্ণ ও কুঞ্চিত, যার পরে আর শীতবোধ, ক্ষুধাবোধ কিছু থাকতে পারে না।

'ভিক্ষে করিস কেন, মোট বইতে পারিস না ?' ধমকে উঠলেন রাজীববাবু।

ছেলেটা বললে ভীতু মুখে, 'ভিক্ষে করিনা আমি।'

'কুলি তুই ? বোঝা নিস্ ?' রাজীববাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'খবর্দার নরোত্তম'—যে কুলিটা মাল ধরেছিলো সে বেশ চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠলো।

'নিশ্চয়। মাল তোমার হাত-ধরা, আমি কথা কইবো কেন ?'

'আচ্ছা বাবু, একটাকা দেবেন। বকশিস যদি না দেন, কি আর করি ! চলুন।' কুলিটা নীচু হলো মাল তুলতে।

'না।' রাজীববাবু বললেন দৃঢ় কণ্ঠে।

কুলিটা নরোত্তমের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে চলে গেলো।

'কুলি তুই ?' রাজীববাবু জিগ্যেস করলেন নরম গলায়।

'কুলি নই বাবু, আমরা মুটে, মাথা-মুটে।'

সংক্ষেপে ইতিহাসটা সেরে নিলো নরোত্তম। সে ঘাটের কুলি নয়, সে বাইরের কুলি। মানে, সর্দারের তাঁবে যেসব কুলি থাকে সে তাদের দলের নয়, সে ভিন্ন গোষ্ঠির। সে ছুটো, উট্‌কো। কুলিতে সে কুলীন নয়। তাই ওসব মার্কামারা কুলির সঙ্গে সে আসতে পারে না। অনেক দেরি করে লুকিয়ে চুরিয়ে, অনেক পাহারা ডিঙিয়ে আনাচ-কানাচ দিয়ে তাকে ঢুকতে হয়।

যে মালে ঘাটের কুলি হাত দেয়, তাতে সে চোখ পর্যন্ত দিতে পারে না। সে মাল তাদের পরিত্যক্ত, তাতেই তার দাবী চলতে পারে। কিন্তু তার জন্যে কে বসে থাকবে ?

'কুলিন কুলিতে আমার দরকার নেই। কত নিবি বল্ চট্‌পট্।'

নরোত্তম হঠাৎ তার টেনির থেকে কিছু পয়সা বের করলো—সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি। বাঁ হাতের চেটোর ওপর রেখে গুনতে লাগলো ডান হাতের আঙুলে করে, সরিয়ে সরিয়ে একটি একটি করে।

ওর সঙ্গে রাজীববাবুও গুনলেন। সাড়ে এগারো আনা। আর দশ পয়সা। 'আর দশটা পয়সা হলেই আমার চলে যায়। আমি তবে চলে যেতে পারি।' বললো নরোত্তম।

ইতিহাস শোনবার আর সময় নেই। রাজীববাবু বললেন, 'আচ্ছা দেব'খন চার আনা।'

নরোত্তম টলতে টলতে বাক্স বিছানা তুললো মাথার ওপর।

'দেখিস, ফেলিস্‌নে যেন'—টালটা ঠেকিয়ে দিলেন রাজীববাবু।

'এর চেয়ে কত ভারি ভারি মোট নিই! তবে কিনা কাকার অসুখের পর থেকে—আমাকে খালি খালি দেখতে চাচ্ছেন বলে—'

কে শোনে তার ইতিবৃত্ত? ভালোয় ভালোয় মালটা গাড়ীতে তুলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কে মাল বয়ে নিয়ে এসেছিলো—ঘাটের কুলি, না, আঘাটার কুলি কিছু এসে যাবে না। তেমনি বোধহয় এসে যায় না তিনি ফার্স্ট ক্লাসে এসেছিলেন, না, থার্ডক্লাসে।

গ্যাংওয়ের মুখে ভীষণ ভিড়। নামতে হলো নরোত্তমকে। মোট মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকতে তার আপত্তি নেই। বরং এই ফাঁকে একটু কথা বলবার সময় পাবে হয়তো। কোথায় একটু সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়েছে অমনি ছুটে বেরুচ্ছে কথার তারাবাজি! অনেক কথা।

এবার সে যেতে পারবে তার কাকার কাছে। এতদিনে ট্রেন ভাড়াটা তার যোগাড় হলো। কাকা যেখানে আছে—জয়চণ্ডীপুরে আড্ডিদের ধানের গোলায় সে কাজ করে—সেখানকার রেলের ভাড়া চৌদ্দ আনা। কাকার সেখানে ঘোরতর অসুখ। বাঁচবে না নাকি! তাকে দেখতে চাচ্ছে একবার। সংসারে বাপ-মা নেই, এই কাকাই তার সবকিছু। কাকীর সঙ্গে রাগ করে চলে আসে সে এই শহরে, আঘাটের কুলি হয়ে। কিন্তু যেই খবর পেয়েছে কাকার অসুখ, তাকে দেখতে চায়, সেই থেকে তার খাওয়া নেই। আজ চার দিন।

ভাঙা ভাঙা শুনছিলেন রাজীববাবু। কোনোটা কানে ঢুকছিলো

কোনোটা ঢুকছিলো না। হঠাৎ শেষের কথায় তিনি চমকে উঠলেন, 'না খেয়ে আছিস—এই চার দিন?'

'নইলে রেলভাড়া জমাবো কি করে? খেতে পাইনা শুনলে লোকে তবু দু-চার পয়সা দিলেও দিতে পারে, কিন্তু রেলে চড়ে জয়চণ্ডীপুর যাবো শুনলে লোকে টিটকিরি দেবে—'

তক্তার পথটা খানিকটা খোলসা হয়েছে। নড়বড়ে ঘাড়ে চলতে চলতে নরোত্তম বললে, 'খেতে পাইনা শুনলেও আজকাল কেউ পয়সা দেয় না। বলে, কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সব দিকে, ভাতের দুর্ভিক্ষ আর কোথায়, তুই যে এখনো সেই সাবেক কথাই বলছিস। সবাই ঠাট্টা করে। তাই পেটের খিদের কথা কাউকে বলিনি হুজুর। পড়ি মরি করে দিন-রাত্তির কুলিগিরি করছি। ঘাটের কুলির ছাড়া মাল ধরেছি, চারদিনে মোট এই সাড়ে এগারো আনা হয়েছে। চৌদ্দ আনা হলেই চলে যাবো জয়চণ্ডীপুরে। কাকার চোখ বোজবার আগে—'

'সে কি কথা!' রাজীববাবু বললেন অন্যমনস্কের মতো, 'আগে খাওয়া, পরে অন্য সব। খেয়ে নিয়ে গায়ে জোর পেলে, চাই কি, ঐ চৌদ্দ আনার রাস্তা তুই হেঁটেই মেরে দিতে পারিস। লোকে তো কতো চালাকি ফিকিরি করেও—এই গাড়ি, এই কামরা—এই যে টিকিট লাগানো আছে।'

মাল তুলে দিলো নরোত্তম। তারপর অন্ধকারে হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলো। বিছানাটা পেতে-নিয়েই রাজীববাবু তাকিয়ে দেখলেন, নরোত্তম নেই।

বুকে হাত রেখে দলিলের খাঁজটা অনুভব করতে পারলেন না। দেখলেন, স্টিমারের সেই গুঁফো লোকটা প্ল্যাটফর্মে পাইচারী করছে।

সর্বনাশ হয়েছে তাহলে! ঐ আঘাটের কুলিটাই তা হলে ওর সাকরেদ! কিন্তু ভোজবাজিতে দলিল উড়ে যেতে পারে নাকি কাপড়ের পাহাড় ভেদ করে? গাড়ীতে উঠে একের পর এক জামা

খুলে দেখতে লাগলেন রাজীববাবু। না, ঠিকই আছে দলিল্ল। শার্টটা উল্‌টো করে পরেছেন বলে বুকের ওপর হাত রাখা উচিত ছিলো তাঁর ডান দিকে, বাঁ দিকে নয়।

কিন্তু ভাড়া না নিয়ে কুলি ছোঁড়াটা হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেলো কোথায়? জয়চণ্ডীপুরের ও টিকিট কিনবে না? পুরো পয়সা কই ওর কাছে? নিশ্চয়ই কোনো সূক্ষ্ম মতলব আছে ঐ গুম্ফবানের। তখন থেকে হাঁটছে প্লাটফর্মে আর আড়চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে।

গার্ড যাচ্ছিলো কাছ দিয়ে হেঁটে, রাজীববাবু জিগ্যেস করলেন, 'কত দেরি আর ছাড়বার?'

'বিয়াল্লিস মিনিট।'

মনে মনে হাসলেন রাজীববাবু। নেমে পড়লেন, ব্ল্যাক আউটের ষ্টেশনে, তাকাতে লাগলেন ইতিউতি। নরোত্তমের সন্ধানে নয়, রেস্টুরেন্টের সন্ধানে। ভয় নেই, সময়ে ঠিক হাজির হবে নরোত্তম।

খাবার অর্ডার দিলেন। কি অসম্ভব দাম। তবু ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার হয়ে ডিনার না খেয়ে নিলে মান থাকবেনা।

সর্বনাশ! ঐ গুঁফো লোকটাও আর একটা টেবিলে খেতে বসেছে। বুকের ঠিক জায়গায় হাত রাখলেন রাজীববাবু। ঠিক আছে দলিল। আরো একজন খেতে বসেছে, খেতে বসেছে স্টিমারের হোটেলে। সবচেয়ে রদ্দি ও শস্তা খাবার, তারই দাম আট আনা! শুধু ভাত, ডাল আর একটা ঘ্যাট্।

'মাছের টুকরো কতো একখানা?'

'দু-আনা।'

'দাও, দিয়ে দাও। যা থাকে বরাতে, খেয়ে নিই। আগে খাওয়া, পরে অন্য সব।'

'আর ঐ টকটা কতো করে?'

'হাতা ছ-পয়সা করে।'

সবমিলে সাড়ে এগারো আনাই হলো। চেটে পুটে পেট ঢাক করে খেয়ে নিলো নরোত্তম।

এঞ্জিন এসে লেগেছে গাড়ীতে। গলগলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। টিকিট—টিকিট কিনলো কই আর নরোত্তম? তবে কি যাবে না সে জয়চণ্ডীপুর? ভুলে গেছে সে তার কাকাকে?

যদি সে খোঁড়া হতো, লাঠি ধরে ভিক্ষে করতে করতে চলে যেতো রেলে চেপে। যদি কাণা হতো, যেতো হাঁড়ি বাজিয়ে গান করতে করতে। যদি ফিরিওয়ালা হতো, যেতো দাঁতের মাজন আর হাজা-পোড়ার ওষুধ বিক্রি করতে করতে।

ভিক্ষুকের ছাড়পত্র নেই, নেই তার ফিরিওয়ালার লাইসেন্স। সে এই জীবনের আঘাটের কুলি।

গাড়ী ছাড়ে তবু এখনও নরোত্তম এলো না তার পয়সা চাইতে। রাজীববাবু চিন্তিত হলেন, এ কি নতুন ষড়যন্ত্র!

গাড়ী ছেড়ে দিলো। আলো নিভিয়ে ওভার-কোটের ওপর লেপ চাপিয়ে রাজীববাবু শুয়ে পড়লেন।

হু-হু করে গাড়ী চলেছে।

ঘুমোবেন না, ঘুমোবেন না করেও ঘুমিয়ে পড়লেন রাজীববাবু।

কতদূর চলে এসেছেন কে জানে! হঠাৎ তাঁর ভয়ানক শীত করতে লাগলো, যার যত কাপড় তার তত শীত। বুঝলেন, গা থেকে লেপটা নীচের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। শুধু লুটিয়ে পড়েনি, লেপটা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সরে যাচ্ছে বেঞ্চের নীচের দিকে। দস্তুরমতো হাঁটতে-চলতে-নড়তে-চড়তে শুরু করেছে।

'চোর! চোর! ডাকাত!! ডাকাত!! মার্ডার মার্ডার!!! হেল্প্! হেল্প্!' রাজীববাবু রাসভনিন্দিত কণ্ঠে চেঁচাতে শুরু করলেন।

কোথায় আলো, কোথায় অ্যালার্ম-চেন—রাজীববাবু পাগলের মতো এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করতে লাগলেন। শিয়রের কাছেই যে

আলোর সুইচ আর হাতের কাছেই যে ঝুলন্ত অ্যালার্ম-চেন, নজরেই এলো না তাঁর। চিরকাল ইন্টারে চেপেছেন, হাতড়াতে লাগলেন দরজার ওপরের দেয়ালটা।

নাঃ, পেয়েছেন অ্যালার্ম-চেন। টানতেই গাড়ীটা থামলো না। থামলো আরো অনেকটা দূর গড়িয়ে গিয়ে। কিন্তু থামবার আগেই দরজা খুলে চলন্ত গাড়ী থেকে লোকটা নেমে গেছে কায়দা করে।

লোকটা নেমে যেতেই রাজীববাবু নিঃসংশয় হয়ে আলো জ্বালাতে পারলেন।

সব জিনিসই ঠিক আছে। কিন্তু তাঁর দলিল? বুক হাতড়ে দেখলেন, সব সমতল, খাঁজ নেই।

'আমার দলিল—দলিল নিয়ে পালালো। ধরো ধরো—'

সবাই ধরে ফেললো সহজেই। নরোত্তম শুয়ে আছে পুলের কাছে, মুখে শুধু রক্তই ওঠেনি, সদ্য-খাওয়া ভাতও উঠে এসেছে।

না, ঠিক আছে দলিলটা। তাড়াতাড়িতে আবার পকেটের দিক্‌ভ্রম হয়েছিলো তাঁর।

'এই সেই ছোঁড়াটা। চুরি করতে ঢুকেছিলো আমার কামরাতে। লুকিয়ে ছিলো বেঞ্চের তলায়। গা থেকে লেপ টেনে নিচ্ছিলো। তাড়া করতেই লাফ দিয়েছে মরিয়ার মতো।'

'নিয়েছে কিছু?'

পারেনি নিতে। মনিব্যাগটা ছিলো বালিশের ওয়াড়ের খোলে। চোর ছাড়া আর কি? এই মস্তবড়ো ট্রেনের সংসারে কেউ তার আপনার নেই, কেউ তাকে চেনে না। চেনে বলে স্বীকার করতেও প্রস্তুত নয়। সঙ্গে তার একটা ফুটো পয়সাও নেই। কোথাও তার পাওনা আছে কিনা সে হিসেবেরও নিকেশ মেলে না কোথাও।

'লাশ দিয়ে দিও সামনের ষ্টেশন মাস্টারের জিম্মায়!'

ফের চললো গাড়ী।

কিন্তু রাজীববাবুর কেবলি সন্দেহ হতে লাগলো, তাঁর দলিল আর অটুট নেই পকেটে! যা আছে তা শুধু শূন্য, শাদা কাগজ। এক এক করে জামা খুলে বার করলেন সেই সব দলিল। ঠিক আছে। কিন্তু একি! শাদা উল্টো পিঠে এসব কি লেখা—বাংলা অক্ষরে, কাঁচা, আঁকা বাঁকা হরফে!

মনে মনে যেন স্পষ্ট পড়লেন রাজীববাবু:

'তুমিই আমাকে চোর বানিয়েছো। শুধু তাই-ই নয়, আমার চার আনা পয়সা নিয়েছ চুরি করে।'

হঠাৎ থেমে পড়লো গাড়ী।

স্টেশন। জয়চণ্ডীপুর।

এইটেই সেই সামনের স্টেশন। গার্ড এইখানেই লাশ নামিয়ে দিলো স্টেশন-মাস্টারের হেপাজতে।

কাজকর্ম করছে না। কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

'কি হলো ?—কাঁদছিস কেন ?' জিগ্যেস করলেন সুধীরবাবু।

কথা বলছে না ছেলেটা। কান্নারও আওয়াজ করছে না। স্থির, শূন্য চোখে চেয়ে আছে, আর দু-গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। কান্নাটা যেন অপমানের কান্না নয়—অভিমানের কান্না।

'কি হয়েছে কিছু না বললে বুঝবো কি করে ? কেউ মেরেছে ?' ছেলেটার মুখটা উঁচু করে তুলে ধরলেন সুধীরবাবু।

এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে ছেলেটা বললে, 'আমি বাড়ি যাবো।'

বাড়ি যাবি! কোথায় বাড়ি তোর ? কথাটা জিভের ডগায় এসেছিলো, সামলে নিলেন সুধীরবাবু।

ওর বাড়ি কোথায়, সুধীরবাবু যেন জানতেন এক দিন। যেন ঝাপসা-ঝাপসা এখনো মনে পড়ে। ট্রেনে অনেক মাঠ ভেঙে, স্টিমারে অনেক জল ঠেলে সে-কোথায় এক তেপান্তরের রাজ্যে এসে পৌঁছুতে হয়! অনেক জলের মধ্যে একটুখানি শুকনো জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের মধ্যেই ওর বাড়ি। হোগলা পাতার কুঁড়ে-ঘর।

জানতেন সুধীরবাবু। সেই বাড়ি থেকেই তাকে তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন। বলেছেন, যখন বলবি তখুনি তোকে ছুটি দেবো।

সেই ছুটিই চাচ্ছে এখন রাজু। বাড়ি যাবে! মনে কষ্ট হয়েছে তাই বাড়ির কথা মনে পড়েছে।

বাড়ি-অর্থ শুধু হোগলা পাতার কুঁড়ে-ঘর নয়। বাড়ি-অর্থ তার মা, ছোটো একটি বোন, আরো ছোটো একটি ভাই।

'বাড়ি যাবি কি রে ?' ধমকে উঠলেন সুধীরবাবু : 'বাড়ি কি তোর একবেলার হাঁটা পথের রাস্তা ? এ গাঁ থেকে ও গাঁ ? সে কোন্ মুল্লুকে তার খেয়াল আছে ?'

'হোক।' কান্না-ছলছল চোখে তাকালো রাজু: 'তবু আমি যাবো। দেশে যাবো।'

'দেশে যাবি? কার দেশ?'

এমন অসম্ভব প্রশ্নও হতে পারে এমনিভাবে চোখ বড় করলো রাজু। বললে, 'কার আবার! আমার দেশ!'

'তোর দেশ!' নিজেরও অলক্ষ্যে সুধীরবাবু টিটকিরি দিলেন।

মুহূর্তে সঙ্কেতটা যেন নতুন করে আবার স্পষ্ট হলো রাজুর কাছে। যেন মনের ভিতর থেকে বুঝলো, ও দেশ আর তার নয়। তাদের নয়। জল-জঙ্গল তেমনি ঠিক আছে, আকাশ আর মাটিও তেমনি ঠিক আছে—হয়তো তাদের হোগলা পাতার কুঁড়ে-ঘরও থাকবে অটুট হয়ে—তবু, তবু কি যেন সেখানে নেই, কি যেন সেখানে থাকবে না! সেখানে ফুল ফোটে, কিন্তু গন্ধ নেই! পাখি ওড়ে কিন্তু গান করে না। হাওয়া বয়, কিন্তু নেই সেই সুখস্পর্শ!

বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে রাজুর! যখন ছুটি পেয়ে বাড়ি যাবে তখন কি-রকম না-জানি দেখবে সে চারদিকে! মা আছেন, কিন্তু তেমন শান্তিতে আর হাসেন না তিনি। ছোটো ভাই-বোনরা আছে, কিন্তু তেমন আনন্দে তারা করে না আর কলরব। ভোর আসে, কিন্তু কোনো আশা আনে না। রাত আসে, নিয়ে আসে ভোর-না-হবার ভয়।

কি ভেবে আবার তার উথলে উঠলো কান্না।

'যাবি, যাবি। এখন কি? পূজোর সময় যাবি। এখন আয় আমার সঙ্গে। খাবি আয়।' সুধীরবাবুর স্ত্রী সুরেশ্বরী এসে অনুনয় করলেন।

ছেলেটা নড়লো না। মুখটা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

'যা না—' হুমকে উঠলেন সুধীরবাবু। 'কাজকর্ম করবিনে?'

তবু ছেলেটা আকাট। অসাড়।

এ কি বেয়াড়াপনা! খুদে পুঁচকে একটা চাকর, তার কিনা এতটা ঘাড়-মোটা! সুধীরবাবুর ইচ্ছা হলো, ধাক্কা মেরে ছেলেটাকে নড়িয়ে দেন এই কোণ থেকে। এই কান্নার আবছায়া থেকে।

কিন্তু সুরেশ্বরী নিজে খাবার এনেছেন। একবাটি মুড়ি, দুটো কলা আর মিষ্টি। এক হাতা দুধও ঢালা আছে বোধহয়।

'নে, আয়। বোস। মেখে খাইয়ে দিই তোকে।'

আঁধার মুখ এতক্ষণে ফর্সা হলো রাজুর। মন্ত্র-পড়া সাপের মতো সুরেশ্বরীর কোলের কাছে বসে পড়লো।

'ব্যাপার কি?' সুধীরবাবু কৌতূহলী হলেন।

'আর বলো কেন—' কথাটা চাপতে চাইলেন সুরেশ্বরী।

'ব্যাপার আমি, বাবা!' মুহূর্তে সেখানে লাফিয়ে পড়লো রঘুনাথ। গায়ে গেঞ্জি, পরণে হাফ-শার্ট, খালি পা। বাঁ হাতে এক পাটি সু, ডান-হাতে বুরুশ। বয়স তেরো-চৌদ্দ। প্রায় রাজুর সমান-সমান। তেমনি হিলহিলে। বললে, 'ব্যাপার সম্পূর্ণ আমি।'

'কেন, কি ব্যাপার?'

'তোমার জুতোয় ও কালি দিচ্ছিলো। বললুম, "আমারটায়ও দিয়ে দে।" তা ও কিছুতেই দিলে না। বললে, "আমি তোমার বাবার চাকর, তোমার চাকর নই। তুমি রোজগার করো না, তোমার থেকে মাইনে পাই না আমি।" শোনো কথা! আস্পর্ধাটা দেখ!'

দেখলেন সুধীরবাবু। দেখলেন দিব্যি গরস পাকিয়ে রাজুকে খাইয়ে দিচ্ছেন সুরেশ্বরী।

'তুমি কি বললে?' সুধীরবাবু তাকালেন ছেলের দিকে।

'আমি শুধু বললুম, ইডিয়ট!'

'শুধু এই?' সুরেশ্বরী কটাক্ষ করলেন।

'স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই বাবা।' বললে রঘুনাথ: 'আমি ওর মাথায় ঠাঁই করে এক গাঁট্টা বসিয়ে দিলাম।'

'শুধু একটা ?' এবার রাজু আপত্তি করলো।

'আপনি কি বললেন শুনি তারপর ?' চোখ-মুখের একটা মারমুখো ভঙ্গি করলো রঘুনাথ। সুধীরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিছুতেই যখন ও আমার জুতোতে কালি দিতে রাজি হলো না, তখন, কাজে-কাজেই, আমি আমার নিজের জুতোতে নিজেই কালি দিতে বসলাম। তখন ও ছুঁচোটা আমাকে কি বললে জানো ?'

'কি ?'

'বললে—একেবারে দন্ত বিকাশ করে বললে, "কেমন হলো ? নিজের মুখেই কালি পড়লো তো !" অর্থাৎ কিনা, বুঝলে কিনা—আমার মুখটা যেন—কথার একবার স্পর্ধা দেখ ছোঁড়ার ! আমিও তেমনি পটাপট আরো গোটা কয় বসিয়ে দিলাম এলোপাথাড়ি।'

রাজুর আর তাতে দুঃখ নেই একফোঁটা। খেতে-খেতে সে এখন দাঁত দেখিয়ে হাসছে।

'বয়ে গেল !' এক হাতে জুতো আর অন্য হাতে বুরুশ নিয়ে দোতলায় উঠে গেলো রঘুনাথ। বলতে-বলতে গেলো : 'আমার নিজের কাজ আমি নিজেই করে নিতে পারবো—'

এই নিয়েই বিরোধ। রাজু রঘুনাথের বন্ধু হতে, সহচর হতে রাজি আছে ; কিন্তু চাকর হতে রাজি নয়। মরে গেলেও নয়। বন্ধু হিসেবে, সঙ্গী হিসেবে সেবা চাও, রাজু প্রস্তুত ; কিন্তু যে কাজের মধ্যে আদেশ আছে—প্রার্থনা নেই, অবজ্ঞা আছে—করুণা নেই, তাতে রাজু চিরদিন পেছপা। ঘাড় যদি সে একবার বাঁকায়, রদ্দাই মারো আর ঘি-ই ডলো, কিছুতেই সে-ঘাড় আর সোজা হবার নয়।

'কেন, আমার গেঞ্জিটা ও কেচে দিতে পারবে না ?' উপর থেকে চেঁচামেচি শুরু করেছে রঘুনাথ।

'ফেলে দে নীচে।' নীচে থেকে বললেন সুরেশ্বরী : 'বনমালী কেচে দেবে'খন।'

বননালী সরকারী চাকর। আট প্রহরের চাকর। হেন কাজ নেই তাকে দিয়ে করানো না যায়। এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে সে সব সময়।

'কেন, বনমালী তো এখন মশলা পিষছে। তোমাদের নবাব-পুত্তুর কি করছেন ?'

কিছু একটা করছে নিশ্চয়ই রাজু। খোদ বাবুর কোনো কাজ, নয়তো মা'র ফরমাজ। কিছু না-করছে তো নিদেন খাচ্ছে।

'দরকার নেই। ঈশ্বর যখন দুটো হাত দিয়েছেন তখন নিজেই কেচে নিতে পারবো।'

অথচ, এদিকে, গুলতি তৈরি করে দে তো রাজু, গুলতি তৈরি করে দিলো। ডাং-গুলি বা ক্রিকেট-খেলার ষ্টাম্প দরকার, রাজু গাছের ডাল কেটে আনছে, চাঁচছে-ছুলছে। ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিতে হবে, বললেই হলো, কাচের গুড়ো থেকে শুরু করে যাবতীয় সরঞ্জাম যোগাড় করে দিচ্ছে। খাঁচায় পাখি পোষবার সখ হয়েছে, বলামাত্র, তৈরি করে দিচ্ছে খাঁচা ; আর পাখি যদি উড়ে বা মরে যায়, ভয় কি, গাছে উঠে খাস পাখির বাসা থেকেই ধরে আনছে দু-একটা। কালোজাম বা গোলাপজাম, যাই কেননা খেতে চাও, চোখের ইসারায় উঠে পড়বে সে মগডালে—যদি ডাব খেতে চাও, দু-পায়ে একটা দড়ি জড়িয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে ধরবে গিয়ে সে বৃন্তপত্র। মুচড়িয়ে-মুচড়িয়ে শিস ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেবে সে ডাব। যদি লুফতে না পারো, যদি মাটিতে পড়ে ফেটে যায়, এক হাতে গাছ ধরে আর অন্য হাতে ডাব নিয়ে কোনো রকমে সে নেমে আসতে পারবে। মোটে আস্ত একটা ডাব, আমাকে না-হয় শাঁসের একটু ভাগ দিও, জলটাই খাও। তাদের দেশে, নারকেল-সুপুরির দেশে, রাজু এমন ঢের-ঢের ডাব খেয়েছে।

কিন্তু যদি বলো, রাজু আমার টেবিলের তলাটা পরিষ্কার করে

দে তো—রাজুর অমনি অস্বীকার। বেশ সহজ সদয় ছিলো, নিমেষে বিমুখ হয়ে দাঁড়ালো। বললে, 'বনমালীকে বলো। ঝাড়া-পোঁছার কাজ নয় আমার।'

'তবে যে বাবার ঘর পরিষ্কার করিস ?'

'কার সঙ্গে কার তুলনা! তিনি হচ্ছেন ঝাড়, আর তুমি হচ্ছো একটি আস্ত ফ্যাকড়া।'

'দাঁড়া, তোর বিষ ঝাড়বো একদিন। গোবেড়েন দিয়ে ভূত ছাড়াবো তবে অন্য কথা।'

'ছাড়া ভূত তখন যাবে কোথায় ?' রাজু হেসে উঠলো ঃ 'জায়গা না পেয়ে তখন তোমরাই কাঁধে চেপে বসবে। ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে তোরে পেলাম কাছে—' বলে আবার তার হাসি।

ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। এক চিলতে মাঠ। একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে খাল। জঙ্গলটা কাঁটা-ঝোপের, খালটা কচুরি-পানায় ঠাসা। আর দু-দিকে ধান ক্ষেত।

ছেলে বিশেষ নেই, তাই পার্টি করা যাচ্ছে না। একজন পিটছে, আর সবাই খাটছে, ঘুরে ঘুরে বল করছে। রাজুকে যদিও বল করতে দেওয়া হচ্ছে না, খাটছে সে মহা আনন্দে—ছুটে ছুটে বল কুড়িয়ে আনছে। কখন যে তার পেটবার পালা আসবে বা আদৌ আসবে কিনা, তা সে নিজেই জানে না। তবু সে যে দলের একজন হয়ে খাটতে পারছে, এই তার অনেক সুখ।

হাতের আরামে এমন এক মার দিয়ে বসলো রঘুনাথ, বল গিয়ে পড়লো কাঁটা ঝোপের জঙ্গলে।

কে এখন খুঁজে আনে বলটা ?

আর কে! রাজু ছাড়া আর কে আছে দুঃসাহসী ? রাজু ছাড়া আর কে আছে কষ্টসহিষ্ণু ?

'যা না। খুঁজে নিয়ে আয়।' হুকুম করলো রঘুনাথ।

গায়ে মাখলো না রাজু ? এখানে হুকুম-পালনের কথা নেই, আছে দায়িত্ব-পালনের কথা। সবার সঙ্গে সেও যখন খেলছে, তখন তারও নিশ্চয় দায়িত্ব আছে বলটিকে উদ্ধার করে আনার।

'আমরাও এদিক-ওদিক খুঁজছি। তুই ভেতরে চলে যা।'

'তা আর বলতে হবে না। সব পিটুনিতে ওস্তাদ, খাটুনিতে নয়।'

কাঁটা-জঙ্গলের মাঝখান থেকে বল উদ্ধার করে এনেছে রাজু। পিঠের চামড়া জায়গায়-জায়গায় উঠে গিয়েছে। রক্ত বেরিয়েছে। সেদিকে কারু দৃষ্টি নেই, বল যে পাওয়া গিয়েছে এই-ই যথেষ্ট।

খেলার শেষে রঘুনাথ বললে, 'এই, তুই তো খুব ভালো সেলাই করতে পারিস—'

'আমি বিশ্বকর্মা—' রাজু চোখ বড়ো করে হাসলো।

'তোর সঙ্গে সেই বল খুঁজতে গিয়ে—দেখেছিস তো—কাঁটার খোঁচায় প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে। নতুন প্যান্ট—মা দেখতে পেলে বকবে। সেলাই করে দে না একটু—'

'আমার বয়ে গেছে। আমার পিঠটা যে ছিঁড়ে গেলো তা কে সেলাই করে ?'

এ অপমান তবু সহ্য হয়, কিন্তু সেদিন ফুটবল খেলতে গিয়ে হলো কি ?

ঐ সেই এক চিলতে মাঠ—একদিকে কাঁটা-ঝোপ, অন্যদিকে খাল। কিন্তু উৎসাহের কমতি নেই। ফুটবল বলে ছেলেও এসে বেশি জুটেছে। এইট-এ-সাইড পার্টি হয়েছে। পাড়ার গোবিন্দ-দা রেফারি হয়েছেন।

লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে রেফারিগিরি। শুধু খেলার ভুলচুক ধরার জন্যই নয়, কার কিকে বল গিয়ে জলে পড়লো বা জঙ্গলে ঢুকলো তাও বলে দেবার জন্য। কেননা কথা হয়েছে, যে জলে বা জঙ্গলে বল পাঠাবে, তাকেই আনতে হবে উদ্ধার করে।

জলে পড়লেও বা উদ্ধার করা সম্ভব, কিন্তু জঙ্গলে ঢুকলে কাঁটায় খোঁচায় একেবারে ফুড়ুক-ফাই !

তাই গোলের কাছে এসেই বিরুদ্ধ দল সাবধানী হয়ে যায়। শটের কেউ ঝুঁকি নেয় না, যা গোল বাধায়।

বাঁশ কেটে গোল-পোষ্ট তৈরী করেছে রাজু। আশা ছিলো, তাকেও খেলায় নেবে। কিন্তু তার জায়গা হয়েছে লাইনের বাইরে। 'বুঝলি, তুই হলি লাইনসম্যান। লাইনের বাইরে বল গেলে তুই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে আনবি।'

অভিমানে মুখ ভার করে রাজু বললে, 'আমিও খেলবো।'

'আরে, এও তো খেলা। ছুটে-ছুটে মাঠের বাইরে থেকে বল কুড়িয়ে আনা। বেশ, পা লাগাতে চাস, বল কুড়িয়ে এনে একটা হাই মারতে পারবি মাঠের মধ্যে। ব্যাস, এই পর্যন্ত। তাই বা কম কি ? যতবার কুড়োবি ততবার একটা করে হাই !'

বুঝতে কিছু বাকী নেই রাজুর। স্রেফ—প্রবঞ্চনা। স্রেফ—অকৃতজ্ঞতা। তবু তা মেনে নিয়েছে রাজু। ভেবে দেখেছে, সে যদি এক দলে নামে, তার জুড়িদার হবার মতো বাড়তি আর কোনো ছেলে নেই ও-দলে। তাই মেনে নিয়েছে রাজু। খেলছে সে শুধু বল কুড়িয়ে আনার খেলা।

পড় তো পড়—বল এবার জলে গিয়ে পড়লো। আর পড়লো স্বয়ং ক্যাপটেন—দু-দলেরই এক ক্যাপটেন—রঘুনাথের শটে।

প্রথমে চেষ্টা হলো ঢিল ছুঁড়ে বলটাকে পাড়ে আনা যায় কিনা। নিয়ে আসা যায় কিনা অন্তত একটা আঁকসির নাগালের মধ্যে।

অসম্ভব। কচুরি-পানার দামের মধ্যে গিয়ে বল আটকেছে। ঢিল বা লাঠি—কিছুরই সাধ্যি নেই তাকে টলায়-নড়ায়।

কাউকে নামতে হয় অগত্যা। কে নামবে ? আর কে ? অগতির গতি রাজু ছাড়া আর কে আছে অগম্য পথে ঝাঁপ দেবে !

‘এই! গামছা পরে নাম না জলে। নিয়ে আয় বলটা।’ হুকুমের গলায় তত নয়, একটু বা অনুনয় মিশিয়ে বললে রঘুনাথ।

সোজাসুজি তাকে বুড়ো আঙুল দেখালো রাজু। বললে, ‘আমার বয়ে গেছে।’

‘তোরই তো বল কুড়িয়ে আনার কথা।’ দু-কোমরে দু-হাত রাখলো রঘুনাথ: ‘তারই জন্যে তো হাই মারতে পেলি এতগুলো—’

‘কখনো না।’ রাজুর মুখে উদ্ধত কাঠিন্য: ‘আমার কোনো কিছুরই কথা নয়! আমি যে দু-পাশ থেকে বল কুড়িয়ে আনছিলাম, তাও নেহাৎ দয়া করে, খেলাচ্ছলে। ধর্মের কল কখন বাতাসে নড়বে তারই দিকে চোখ রেখে। জলে-জঙ্গলে যাবার আমার কথা নয়। সেই জলে-জঙ্গলে যাবে, যার লম্বা-লম্বা ঠ্যাং—’

কথাটা শেষ হলো না। ধাঁ করে এক চড় কষিয়ে দিলো রঘুনাথ। একে লজ্জা, তায় আবার এমনি বিদ্রূপ!

কিন্তু রাজু টললো না একচুল। মুখেও হাসি বজায় রেখে বললে, ‘যতো মারো আর ধরো, আমি নামছি না জলে। রেফারিকে জিগ্যেস করো, কার নামবার কথা! সকলের মতো তুমিও একলাই খেলতে এসেছো, চাকর নিয়ে নামোনি—’

‘তবু, তুই, তোকে বলছি, নামবি না আমার হয়ে? আমার মান রাখবি না? মুখ রাখবি না? আমাকে গামছা পরাবি?’

রাজুর ঘাড়ে-পিঠে আবার কটা চপেটাঘাত।

উপায় নেই। রাজু নির্বিচল। গামছা পরতে হলো রঘুনাথকে।

হো-হো-হো করে হেসে উঠলো সবাই। রেফারি পর্যন্ত। রাজুও হাসলো প্রাণপণ। একতাল কাদা তুলে নিলো রঘুনাথ। দলের আর সবাইকে ছেড়ে দিয়ে, রেফারিকে ছেড়ে দিয়ে তাক্ করে মারলো শুধু রাজুকে! রাজুকে ছোঁয় তার সাধ্য কি? মাঝখান থেকে রাজু আরেক পশলা হাসি হাসলো।

এত হাসাহাসির পর বাড়ি ফিরে এসে সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে কাঁদতে শুরু করেছে রাজু।

'কি হলো তোর? কাঁদছিস কেন?' চোখে পড়তেই জিগ্যেস করলেন সুধীরবাবু। 'রঘু আবার মেরেছে বুঝি?'

তবু সাড়া দেয় না রাজু। হাঁ-না করে না।

'তবে কাঁদছিস কেন?'

'বাড়ির জন্মে মন কেমন করছে। বাড়ি যাবো।'

'তা তো যাবিই পূজোর সময়। আর এই তো ঘনিয়ে এলো পূজো। আর দু-আড়াই মাস শুধু বাকি।'

'না, আজই যাবো।'

'আজই যাবি কি করে? তোদের বাড়িতে যাওয়া কি যে-সে হাঙ্গামা? সে একেবারে আরেকটা আলাদা রাজ্য।'

দু-চোখের শাদায় রাজু যেন কেমন করে তাকালো অন্ধকারে। বললে, 'না, সে তো আমার দেশ

'মিথ্যে কি! কিন্তু সেই স্বপ্নের বসনের সোনার পাড় ছিঁড়ে গিয়েছে যে। তার খবর রাখিস না?'

'কি জানি। কিন্তু যেখানে আমি জন্মেছি সেই আমার দেশ। আমার মা।'

'তা হলেও বাস্তব কতকগুলো অসুবিধে আছে তো। প্রথমত এখানকার টাকা-পয়সা ওখানে চলবে না—তার ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তায় কতো ধর-পাকড়, কতো খানাতল্লাসী! কোন্-কোন্ জিনিস কিভাবে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় তার খোঁজ দরকার—'

'আমার সঙ্গে তো একটা ভাঙা টিনের বাক্স, একটা ছেঁড়া বালিশ আর একটা কাঁথা—'

'তবু সঙ্গে একজন চলনদার দরকার। দাঁড়া, তার আগে খোঁজ করি। একা ছেলেমানুষ পারবি না যেতে। কখন কি বিপদ—'

'খুব পারবো। আমার মাইনে যা জমেছে এতদিন, তাই দিয়ে দিন ফেলে।' কান্নার মধ্যে থেকে বললে রাজু। তাই অভিমানের মতো শোনালো, অবিনয়ের মতো নয়।

এলেন সুরেশ্বরী। তার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'যাবি বই কি। কিন্তু আজই, এখুনি, এই রাত্তিরেই যাবি কি? যাবার আগে মা-ভাই-বোনের জন্যে কিছু কেনা-কাটা করবি না?'

মুহূর্তে জল হয়ে গেলো রাজু। ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'আমার ক-টাই বা টাকা—তা দিয়ে আমি আমার ভাঙা বাক্সে করে আস্ত একটা দোকান নিয়ে বাড়ি ফিরবো অত আহ্লাদে আর কাজ নেই!'

'তা কি হয়! যুগ্যি হয়ে রোজগার করছিস, বছর বাদে বাড়ি ফিরবি, খালি হাতে গেলে কি চলে? ছোটো ভাই-বোন কতো আশা করে চেয়ে থাকবে! মা কতো স্বপ্নের জাল বুনবেন! পূজোর ছুটির আর দেরি কি? পূজোর ছুটিতে সবাই আমরা কলকাতা যাবো, তুইও যাবি আমাদের সঙ্গে। যা তোর সাধ্যে কুলোয়, তাই একটু-আধটু কেনাকাটা করবি। অন্তত মা'র জন্যে একটা শাড়ি, বোনের জন্যে একটা জামা, ভাইর জন্যে একটা হাফ-প্যান্ট। আমরা তোর যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক করে দেবো। সঙ্গে শক্ত চলনদার ধরিয়ে দেবো। কেউ তোর চুলের ডগাও ছুঁতে পারবে না।'

রাজুর চোখে আর জলের বাষ্পও রইলো না।

তাড়াতাড়ি বসলো সে সুধীরবাবুর জন্য নতুন করে তামাক সাজতে। তামাক সেজেই সুরেশ্বরীর সংসারের কাজে যোগান দিতে হাতার সঙ্গে বেড়ি হয়ে থাকতে। চোখের ইঙ্গিতে লাফ-ঝাপ মারতে; চাই কি, মাথায় করে গন্ধমাদন নিয়ে আসতে।

'কিন্তু বাড়ি গেলে ও আর আসবে না, দেখো।' স্ত্রীর কাছে আক্ষেপ করছিলেন সুধীরবাবু। 'বড়ো বিশ্বাসী ছিলো ছেলেটা।'

'আর আমার হাতের লক্ষ্য। বড়ো মায়া পড়ে গিয়েছে ওর

ওপর।' বললেন সুরেশ্বরী : 'যাবে ভাবতেই মনটা টনটন করে ওঠে। আর কোথায়, কোন্ রাজ্যে সে দেশ—'

'যাই বলো, ওকে এবার আর না ছেড়ে দিয়ে পারো না। যতই মায়া পড়ুক, ওর সত্যিকারের মা'র চেয়ে আর কার বেশি দাবি! কতদিন সেই মা'র কাছ-ছাড়া হয়ে আছে ও। দেশে কি হুলুস্থুল ওলোট-পালোট হয়ে গেলো! এর মধ্যে ওর মা-ভাই-বোন কেমন আছে, কোথায় আছে, কে জানে? ছ-মাসে ন-মাসে একখানা চিঠি—তারও এখন ঠিক-ঠিকানা নেই।

একবার গিয়ে সব দেখে আসুক নিজের চোখে। যদি লোকজনের সাহায্যে কিছু বিলি-ব্যবস্থা করতে পারে, তাই চেষ্টা করুক।'

বড়ো বিশ্বাসী ছিলো, তাতে সন্দেহ কি! কিন্তু তারো চেয়ে বড়ো কথা, নির্লোভ। বাড়ির সবাই সিনেমায় গেছে, ও একা বাড়ি আগলেছে, একবারও বলেনি সিনেমায় যাবো। সেদিন যে যাত্রা হলো, সবাই গেলো, সমস্ত রাত পাহারা দিলো রাজু। পরদিন সুরেশ্বরী বললেন, 'তুই আজ গিয়ে দেখে আয়।'

রাজু উদাসীনভাবে বললে, 'আমার মা-ভাই-বোন—তারা কি দেখছে? সে কোন্ নাটক?'

বেড়াতে যাচ্ছেন, পাহারায় বসে আছে রাজু। এক হাতা দুধও সে খাচ্ছে না কড়া থেকে। এসে সুরেশ্বরী আশা করেন গুনতিতে একটা মিষ্টি অন্তত কম হবে, কিন্তু না, সব ঠিকই আছে।

শুধু কি বিশ্বাসী? কেমন বাধ্য-বিনীত। আজকালকার, বিশেষ করে এদিককার, চাকরদের মেজাজ কি! সব সময়ে যেন রুখে আছে। পানের থেকে চূণ খসলেই পরিত্রাহি! সেই ক্ষেত্রে এ একেবারে গঙ্গাজলের মতো। রঘুনাথের চাঁটি খেয়ে জল মাঝে-মাঝে ঘোলা হয় বটে, কিন্তু সুরেশ্বরীর স্নেহের হাওয়া লাগলেই জল আবার নিমেষে নির্মল হয়ে যায়! প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

'যাই বলো, এবার গেলে আর ও ফিরবে না।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুধীরবাবু।

'আমার তো মনে..হয়, উলটো। দেশে গিয়ে ওর মা-ভাই-বোনকে ও এখানে নিয়ে আসবে।'

'এখানে ? এই বাড়িতে ?' আঁৎকে উঠলেন সুধীরবাবু।

'তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ওর আর চেনাশোনা লোক কোথায় ?'

'কি সর্বনাশ ! আমার বাড়িতে এনে ভরবে ওর গুষ্ঠিকে ? অসম্ভব। বারণ করে দাও। ওর গিয়ে কাজ নেই। বলে দাও, সেটা এখন নেকড়ে বাঘের দেশ হয়েছে। মানুষ সেখানে থাকে না।'

সুরেশ্বরী চুপ করে রইলেন।

'মাথায় একটু হাত বুলিয়ে আদর করলেই ও মেনে নেবে তোমাকে। ওকে ছাড়া চলবে না আমাদের। বনমালীকে বিশ্বাস নেই। শুনলাম আশপাশের কারখানায় কাজের চেষ্টা করছে—'

'আর, বনমালী আমাদের এখানকার আট-নম্বর চাকর—'

'সুতরাং, ওকে আটকাও। ওর যাওয়া বন্ধ করো। বলে দাও, ওর বাড়ি-ঘর-দোর পুড়িয়ে দিয়েছে, ওর মা-ভাই-বোনের কোনো পাত্তা নেই। তুই যদি যাস তবে তোকেও কেটে ফেলবে—'

'শুনবে না। তবু যাবে।' বললেন সুরেশ্বরী : 'মা-ও যদি চলে যায়, তবু মাটি আছে। মাটির টান মা'র টানের চেয়ে কম নয়।'

ছেঁড়া বালিশটা সেলাই করছে রাজু।

'এই, এক গ্লাস জল গড়িয়ে দে তো।'

'বয়ে গেছে। নিজে গড়িয়ে নিতে পারো না ? সামনেই তো কুঁজো।' ছুঁচের দিকে চোখ রেখে নির্লিপ্তের মতো বললে রাজু।

'বনমালী ভেগেছে। এখন তুইই সরকারী চাকর। সব কাজ এখন তোর করবার কথা।'

'ও সব বাজে কাজের চেয়ে ঢের ঢের বড়ো কাজ আমার হাতে।'

'আজকে তুই আর বাবার একলার পোশাকী চাকর নস। কথা শুনবি না তো চাঁটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবো।'

'বেশি চেঁচিও না। চেঁচালে তেষ্টা আরো বেড়ে যাবে।'

সঙ্গে-সঙ্গেই রাজুর মাথায় চটাস করে এক চাঁটি।

আমাকে যতই মারো আর ধরো, আমার আর লাগবে না। বাড়ি যেতে আমার আর মোটে মাসখানেক বাকি—'

এক হাতের চাঁটিতে কি ঢোল বাজে? দু-হাত লাগানো চাই। রঘুনাথ দোহাত্তা শুরু করলো।

'বেশি লেগো না বলছি। আমার হাতে এই ব্রহ্মাস্ত্র।' বলে ছুঁচ দেখালো রাজু।

অগত্যা নিজেই রঘুনাথ জল গড়ালে। বললে, 'এখন মা'র আদর খেতে নিচে সিঁড়ির ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসবি না?'

রাজু হাসলো। বললে, 'ক-দিন পরে আসল বাড়িতে গিয়ে সত্যিকারের মা'র আদর খাবো—আমি আর কাঁদবো কেন?'

'বাড়ি যাওয়া বার করবো তোর। ঠ্যাং ভেঙে দেবো, দেখিস।'

তবুও ঘাবড়ালে না রাজু। বললে, 'বয়ে গেছে। তুমি যদি ঠ্যাং ভাঙো, তবে তোমার বাবা আমাকে কোলে করে পৌঁছে দেবেন।'

পূজোর ছুটির মাসখানেকও আর নেই, ছুটি হলেই সবাই কলকাতা যাবেন ঠিকঠাক, হঠাৎ সুধীরবাবুর বদলির অর্ডার এলো। শুধু বদলি নয়, প্রমোশন। এখুনি গিয়ে জয়েন করতে হবে। যতই আগে যাবেন ততই লাভ।

বাঁধা-ছাঁদা শুরু হয়ে গেলো। জিনিস-পত্র সব অলছ-তলছ।

বাক্স-ট্রাঙ্ক গুছোতে বসলেন সুরেশ্বরী। কোথায় কি খটকা লাগলো তাঁর। দু-খানা শাড়ি পাচ্ছেন না, খান দুই ধুতিও বোধ

হয়। ধোপা-বাড়িতে খোয়া গিয়েছে নাকি ? খোয়া গিয়েছে তো তখন হদিস হয়নি ? শাড়ি দু-খানা তো নতুন। কাউকে—কোনো উপলক্ষে উপহার দিয়েছেন সুরেশ্বরী ? কে জানে ? কিন্তু খুকির দুটো ফ্রক পাচ্ছি না মনে হচ্ছে যে। ও মা, রঘুনাথের সেই গরম কোটটা গেলো কোথায় ? আর সেই যে সাত-গজি স্যুটের থানটা ছিলো, সেটা এতো হালকা কেন ?

দুপুরবেলা অফিসে গিয়েছেন সুধীরবাবু। রঘুনাথ আর খুকি যার-যার ইস্কুলে। বালিশ মাথায় দিয়ে মাদুরের ওপর শুয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে রাজু। ডাকলেন সুরেশ্বরী, 'রাজু !'

মা'র ডাক না ? রাজু এক লাফে উঠে বসলো।

'বাজার থেকে সেই একদিন মান্দ্রাজী পান এনে দিয়েছিলি না ? তাই নিয়ে আয় তো চার পয়সার।'

ঘুম মুছে গেলো চোখ থেকে। হাসি মুখে ছুটলো সে পয়সা নিয়ে।

'অতো তাড়া নেই। ঘুমো-চোখে ছুটতে গিয়ে পড়ে না যাস দেখিস।' সুরেশ্বরী সাবধান করে দিলেন রাজুকে। নিজেও সাবধান হলেন। সদর দরজা বন্ধ করলেন। বন্ধ করলেন ঘরের দরজা।

বালিশ তো নয়, তাকিয়া বানিয়েছে একটা !

'নতুন তুলো দিয়ে বালিশটাকে মজবুত করছি।' কথাচ্ছলে একদিন বলেছিল রাজু। কিছু পয়সা ও যেন নিয়েছিলো সেই বাবদ। ছিঁড়ে-খুঁড়ে গিয়েছে বালিশটা, শোয়ার আরামের জন্য বালিশটাকে তাই একটু উঁচু করা দরকার, করুক না—যা ওর খুশি।

এখন দেখা যাক সেই তুলোর কেরামতি।

বালিশের সেলাইর মুখটা কাঁচি দিয়ে ত্বরিত আঙুলে কাটতে লাগলেন সুরেশ্বরী। মুখটা একটু ফাঁক করতেই—যা তিনি ভয় করেছিলেন—দেখতে পেলেন একটা কাগজে মোড়া মোটা পুঁটুলি।

সর্বনাশ ! কি হবে ! হে ভগবান, সত্যি যেন তা না হয় !

পুঁটলির মূল কই ? কি করে সংশয়াতীত হবেন যে, পুঁটলিতে শুধু আজে-বাজে তুচ্ছ জিনিস আছে। সংসারে ফেলে দেওয়া অকিঞ্চিৎকর টুকিটাকি। ছেঁড়া চট বা তোয়ালে, গেঞ্জি বা পর্দা। নয়তো ছেঁড়া জুতো। কাগজের বাক্স বা ছবির ম্যাগাজিন। এই জাতীয় কিছু পরিত্যক্ত হিজিবিজি। হে ভগবান, এর বেশি যেন আর কিছু না দেখি। আঙুল দিয়ে টিপতে নরম লাগছে। তা, কাপড়-জামা ছাড়াও তো আরো আছে অনেক নরম জিনিস !

সেলাইয়ের মুখটা আরো বড়ো করতে হয় একটু। ঐ এসে পড়লো কি রাজু ? বাজার কি মোট দশ মিনিটের পথ ?

হাত কাঁপছে সুরেশ্বরীর। পুঁটলির মুখ পেলেন। ভাঁজ সরিয়ে ফাঁক দিয়ে দেখলেন—যা কল্পনা করবেন না ভেবেছিলেন ঠিক তাই—রঘুনাথের সেই গরম কোট, সেই রঙচঙে চেনা পাড়ের তাঁর নতুন শাড়ি। আরো তলিয়ে দেখলে আরো সব জিনিসের সন্ধান মিলবে। হ্যাঁ, ঐ তো দেখা যাচ্ছে খুকির সেই সিল্কের ফ্রক।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সুরেশ্বরী। তাঁর সমস্ত শরীর আড়ষ্ট কাঠ হয়ে রইলো।

এই, যাকে তাঁরা এতদিন সন্তানস্নেহে লালন করেছেন ! বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বাসী বলে, বাধ্য-বিনীত বলে। তার এই ব্যবহার ? পাহারাওয়ালা সেজে চুরি করেছে ! খালি বাড়ির জিম্মায় ওকে বসিয়ে রেখে তাঁরা বেড়াতে গেছেন, সিনেমায় গেছেন, সেই সুযোগে ও চাবি দিয়ে বাক্স খুলে-খুলে মাল সরিয়েছে। এক দিনের কাণ্ড নয়। তিল-তিল করে সরিয়েছে দিনে-দিনে। খুলে আবার বন্ধ করেছে বাক্স। এ-বাক্স থেকে একটা, ও-বাক্স থেকে আরেকটা। ভিতরের জিনিস আবার গুছিয়ে রেখেছে পরিপাটি করে। সন্দেহের অভাব রাখেনি কোথাও। মুখে এমন একখানা ভাব যেন এমন ভালো ছেলে, এমন দুঃখী ছেলে, দুনিয়ায় আর নেই !

সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা ধরলো সুরেশ্বরীর। কিন্তু—
ঐ বুঝি এসে পড়লো রাজু।
ক্ষিপ্র হাতে যেমন-কে তেমন বালিশটা সেলাই করতে লাগলেন
সুরেশ্বরী। নিখুঁত কারিকরি। যাতে রাজু সন্দেহ করতে না পারে
তাঁর গুপ্ত আবিষ্কার। যেমন-কে-তেমন বালিশটা রাখলেন মাদুরের
উপর। শ্রান্ত হয়ে এসে কালসাপ নিদ্রা যাবেন বালিশে।
'মাগো, একেবারে টাটকা সাজিয়ে এনেছি পান।' হাঁপাতে-
হাঁপাতে বললে এসে রাজু: 'যাকে বলে একেবারে ফেরেশ। মুখে
দেবে আর অমনি গলে যাবে। দোকানি বলে, পান নয় তো পান্তুয়া।'
ভেবেছিলো মা বুঝি হাসবেন। কিন্তু মা'র মুখ কঠিন।
তবে আমার কি খুব দেরি হয়ে গেছে? ঠিক যে সময়টিতে
দরকার, সে সময়টিতে আনতে পারিনি পান? এ কি মা'র অভিমানের
মুখ? কিন্তু, কই, মা'র মুখে তো কোনোদিন অভিমান দেখিনি।
'যেমনি গেছি তেমনি এসেছি—এক নিশ্বাসে। কই, খাচ্ছনা
কেন পান?'
'খাচ্ছি। তুই গিয়ে ঘুমো।'
বালিশে মাথা রেখে যেমন-কে-তেমন শুলো রাজু। শুতে-না-
শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো।
সুরেশ্বরী একবার তাকে দেখলেন। যেন কালসাপ শুয়ে আছে!
ঐ পান খাবে না আরো কিছু! হয়তো ওর মধ্যে বিষ
মিশিয়েছে। ওর পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব নয়।
সন্দেহে বিষ হয়ে পানের ঠোঙাটা সুরেশ্বরী নর্দমায় ফেলে দিলেন।
কিন্তু যেমন ছেলে, হয়তো ঘুম থেকে উঠেই জেরা শুরু করবে পান
খেয়েছি কিনা। তাই ঠোঁট শাদা রাখলে চলবে না। ওর মনে
যাতে না ছায়া পড়ে সন্দেহের। অলক্ষিতেও কোনো প্রশ্ন না জাগে।
তাই বাড়ির পানই তিনি নতুন করে সেজে খেলেন।

আবার গোছগাছে হাত লাগালেন সুরেশ্বরী। হঠাৎ মনের মধ্যে ডাক দিয়ে উঠলো, গয়না-গাটি টাকা-পয়সা সব ঠিক আছে তো? মোটা ওজনের যা, সবই তো ব্যাঙ্কে মজুত আছে। তবু খুচরো কিছু আছে তো সঙ্গে। এখানে-ওখানে জমানো কিছু পুঁজিপাতি। ব্যস্ত হাতে তাই খুঁজতে লাগলেন সুরেশ্বরী। চোখ বলে ঠিক আছে, কিন্তু মন মানতে চায় না। মনের কাছে হিসেব গোলমাল হয়ে যায় বারে-বারে। এমন বিশ্বাসহন্তা অকৃতজ্ঞ যে হতে পারে, তার কাছে আশা করবার আর সাহস কি!

ঘুম থেকে উঠে বিকেলের কাজে লেগেছে রাজু। কড়া চোখ রেখেছেন সুরেশ্বরী। কাঁথায়-মাদুরে জড়ানো বালিশটা ঠিক জায়গাতেই আছে—যেমন থাকে। কাঠের একটা আলমারির মাথায়—নীচে, ভাঁড়ার ঘরে। এক ফাঁকে একবার একটু ফাঁক করে দিয়ে এলেন বিছানাটা, যাতে চলতে-ফিরতে সব সময় চোখে পড়ে সুরেশ্বরীর। পৃথিবীতে আর সব মুছে যাক চোখ থেকে, শুধু জেগে থাক ঐ বালিশটা। জ্বলন্ত একটা আঘাতের রক্তচিহ্ন।

কিন্তু রাত? রাতে যদি উধাও হয়ে যায় বালিশটা? যদি হাত-সাফাই হয়ে চলে যায় অন্য হাতে।

'শুনেছো, সর্বনাশের কথা—' মধ্যরাতের নিরিবিলিতে ঘুমন্ত সুধীরবাবুর গায়ে ঠেলা দিলেন সুরেশ্বরী।

'কেন, কি হলো? ডাকাত?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন সুধীরবাবু।

'ডাকাত নয়, চোর।' স্বর নিম্ন করলেন সুরেশ্বরী।

'চোর? কোথায়?'

'নীচে! নীচের ঘরে।'

'কি সর্বনাশ! কি হবে তবে এখন? চ্যাঁচাও—চেঁচাচ্ছ না কেন?'

'শোনো। ব্যস্ত হয়ো না। উটকো চোর নয়, বাস্তু চোর।' বলে সব বিবৃত করলেন সুরেশ্বরী।

স্থধীরবাবু ভয় থেকে আস্তে আস্তে বিস্ময়ে এসে ঠেকলেন। সে বিস্ময় পাথর দিয়ে তৈরি। তৈরি একতাল স্তব্ধতা দিয়ে।

'হাতের স্থখ করে মেরে ছোঁড়াটাকে পুলিশে দেওয়া যায় অনায়াসে। আরো সহজে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া যায় বাড়ি থেকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে ভঙ্গিটা তুমি নিয়েছো সেইটেই বুদ্ধিমানের ভঙ্গি। আর দিন কয়েকের মধ্যেই বদলি হয়ে যাচ্ছি আমরা বিদেশে, এখন বাঁধা-ছাঁদার হিড়িক, কাজের ল্যাজামুড়ো নেই। তারপর যেখানে যাচ্ছি, সেখানে সম্প্রতি বাড়ি জুটছে না, উঠতে হবে গিয়ে ডাকবাংলোয়। এই অসময়ে চাকর ছাড়াতে গেলে চাকরি ছাড়ারই সামিল হবে। স্থতরাং—'

এইটেই ঠিক ফেঁদেছো। এখনই কিছু হৈ-হল্লা না করা। ওকে বুঝতে না দেওয়া, জানতে না দেওয়া। যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে, ও ধরা পড়েছে, তা হলে মালও যাবে, ও-ও যাবে। অতএব স্রেফ চেপে যাও। শুধু বালিশটার দিকে নজর রাখো।

'কিন্তু একদম চুপ করে থাকলে ও যদি বালিশটা কাউকে চালান করে দেয়।' জিনিসের মায়ায় স্থরেশ্বরী কাতর হয়ে উঠেছেন।

'এ অঞ্চলে ও একেবারে ঘোর বিদেশী।' বললেন স্থধীরবাবুঃ 'প্রাণে ধরে কাউকে ও বালিশের ভার দেবে এ অসম্ভব। বুকে করে রাখবে ও বালিশটা, যতক্ষণ না বাড়ি পৌঁছুতে পারে। ঐ বালিশে ওর মা'র জন্যে শাড়ি, বোনের জন্যে জামা, নিজের জন্যে কোট। আর শোনো—রঘুনাথ যেন না টের পায়। ও যদি আন্দাজ করতে পারে ব্যাপারটা, তবে সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। এমন একটা চোর-মারার প্রলোভন যে ও দমন করতে পারবে এমন মনে হয় না। আগে দেখা যাক কি সরিয়েছে। ভাসা ভাসা দেখে বোঝা যাবে না।'

'রোববার দুপুর ছাড়া তোমার দেখা হয় কি করে?'

'না, না, রবিবার নয়। রবিবার রঘুনাথ বাড়ি থাকবে। ওর

সামনে কিছু হতে পারবে না। আমি কাল দুপুরেই ঘণ্টা-খানেকের ছুটি নিয়ে আসবো। ওকে তুমি বেশ খানিকটা কোথাও দূরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'

ছক-মাফিক কাজ হলো।

'হ্যাঁরে রাজু, একবার স্টেশনে যেতে পারবি?' দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বললেন সুরেশ্বরী।

'খুব পারবো। কেন বলো তো?'

'স্টেশন-মাস্টারের স্ত্রী—সেই সেদিন এসেছিলেন না বেড়াতে? মনে নেই তোর? সেই খাবার কিনে নিয়ে এলি তুই?'

'খুব মনে আছে। কি করতে হবে তাই বলো।'

'সেই ভদ্রমহিলা আমার একখানা বই নিয়ে গেছেন পড়তে। ফেরাবার আর নাম নেই। এখন এখান থেকে চলে যাবো, বইটা ফেরৎ পাওয়া দরকার। নিয়ে আসতে পারবি তুই?'

'এতদিন বলোনি কেন? সে আবার কাকে পড়তে দিয়েছে, কে জানে? যেখানে থাক, আমি ঠিক নিয়ে আসবো।'

'দেরি হলে হবে। খুঁজে পেতে ঠিক-ঠিক নিয়ে আসা চাই।'

বইও তো ভারি। কয়েকখানা মাসিক পত্রিকা! বদলি হয়ে যাবার আগে অমন কত বিলিয়ে দেন প্রতিবেশীদের।

রাজু বাইরে বেরুতে-না-বেরুতেই উপস্থিত হলেন সুধীরবাবু।

সদরে খিল পড়লো। সাবধানের মার নেই—বন্ধ হলো ঘর।

মাদুরে-কাঁথায় জড়ানো বালিশটা তেমনি নিরীহের মতো পড়ে আছে। চাকরের মাথার বালিশ—সামান্য একটা হেলাফেলার জিনিস ছাড়া আর কি! যেন কত সরলতা, কত বিশ্বস্ততার নিদর্শন!

নিশ্চিন্ত হয়ে কাঁচি দিয়ে বালিশের পেট কাটলেন সুরেশ্বরী।

যা-যা অনুমান করেছিলেন, ঠিক-ঠিক তাই। সুটিং-এর কাপড় থেকে প্রায় সাড়ে চার গজ কাটা।

এতেই বেশি দগ্ধ হলেন সুধীরবাবু ; 'নিবি তো নিবি, সবটাই নে। এমন কানা করে যে খুলি, আমার একূল ওকূল দুকূল গেলো।'

'বুঝলে না, থানটা চোখে পড়বে, আর ভাববো ঠিক আছে। এখুনি তো আর দর্জি ডেকে অর্ডার দিচ্ছ না, নাড়াচাড়া হবার সম্ভাবনা নেই। তাই কে সন্দেহ করবে ওর কারসাজি ?'

'সবটাই ওর মাথা খাটিয়ে করা। মাথা খাটানো বলেই তো মাথার বালিশ হয়েছে। ও ভাবতে পারেনি, পূজোর আগে, অসময়ে এমনি বদলি হবার সম্ভাবনা আছে। ভেবেছিলো, শীগ্‌গির আর জিনিসপত্রের খোঁজাখুঁজি হবে না—দিব্যি বালিশ বগলে করে স্বস্থানে প্রস্থান করতে পারবে। সত্যি, বদলির অর্ডার না এলে বুঝতেও পারতুম না এই কীর্তি! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—এ কথাটা ছোঁড়াও প্রায় বলতো। কিন্তু কল-নড়ার বাতাস কোথা থেকে যে কখন বয় কেউ জানে না। নাও, এবার সেলাই করো।'

'আমি বলি কি, জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলি। তার বদলে ন্যাকড়া ঢুকিয়ে দিই।' সুরেশ্বরীর চোখে-মুখে মিনতি ঝরে পড়লো।

'না, না, তা হলে সব মাটি। তা হলে ওকে হাতে-নাতে ধরবো কি করে ? পুলিশে দেবো কি করে ? ওকে কুকুর-মারা করে মারবো কি করে ? ধৈর্য ধরো, ধৈর্যই আসল পুরস্কার। ন্যাকড়া ঢুকোতে গেলে সব জারিজুরি ধরা পড়ে যাবে। বালিশ ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে ও। ওর পাপমুখ আর দেয়ালে ঘসে দেওয়া হবে না।'

'কিন্তু এত ঘাঁটাঘাঁটিতেও তো সন্দেহ হতে পারে।'

'না, না, নিখুঁত করে প্যাকিং করো। আর যদি কোনো সন্দেহ হয়ই, আগে দেখবে মালটা ঠিক আছে কিনা। মাল যদি ঠিক পায়, আর সন্দেহ থাকবে না।'

প্যাকিং-এর পর সেলাই করছেন সুরেশ্বরী, হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

'কে ?'

'আমি রঘুনাথ। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেলো সকাল-সকাল।'

'ওকে ঠেকাও। এখুনি দরজা খুলো না। দরজা খুলে দিলেও ওকে আটকে রাখো নীচে। আমার সেলাই এখনো শেষ হয়নি।'

নীচে গিয়ে ছেলেকে ঠেকালেন সুধীরবাবু। নিশ্চয়ই ইস্কুল ছুটি হয়নি, মিথ্যে-মিথ্যে সে পালিয়ে এসেছে, এমনি অকারণ হুমকি দিয়ে ছেলেকে তিনি আটকাতে চাইলেন। রঘুনাথ তো অবাক! বাপের এমন মূর্তি সে দেখেনি। কি—হলো কি ?

রঘুনাথের উপরে ওঠবার আগেই সেলাই সারা হয়েছে সুরেশ্বরীর। প্রায় কাঁটায় কাঁটায়। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন।

'তোমাদের ইস্কুল আবার এত সকাল-সকাল ছুটি হওয়া ধরলো কবে থেকে ?' বিরক্তিতে গলায় ঝাঁজ ফুটলো সুরেশ্বরীর।

অদ্ভুত প্রশ্ন। থমকে গেলো রঘুনাথ।

'এক-আধ দিন এমনি ছুটি হয়ে যায় আগে-আগে। যদি একজন কেউ মরে বা ইস্কুল কোনো ট্রফি জেতে।'

জিতুক—আমরাও জিতেছি! মুখে এমন একটা ভাব এনে সুরেশ্বরী তাড়াতাড়ি হেসে ফেললেন।

একটা খটকা কেমন বিঁধে রইলো রঘুনাথের মনে। বরং এ অসময়ে বাবারই তো আফিস থেকে ফেরা অস্বাভাবিক।

কিন্তু রাজু, রাজু কই ?

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে রাজু এসে হাজির : 'বই পাওয়া গেলো না। ভদ্রমহিলা বললেন, ও বই নাকি নেহাৎ বিলিয়ে দেবার বই, ফিরিয়ে দেবার নয়। তেমনি নাকি কথা ছিলো। ভদ্রমহিলাও তাই শিশি-বোতলওয়ালাকে বিলিয়ে দিয়েছেন।'

'যাক গে। অনেক খাটুনি হয়েছে। এখন একটু বিশ্রাম কর্।'

গর্বে হাসলো একটু রাজু। এ আবার মেহনৎ কি ? তবু মা'র

মান রাখতে হয়। মাদুর বিছিয়ে শুলো রাজু। তেমনি বালিশ মাথায় করে। তেমনি মুক্ত মনে। সরল সমর্পণের ভঙ্গিতে।

রাত কাটলো। কিছুই সন্দেহ করেনি রাজু। কেনই বা করবে? তার মনে সন্দেহ নেই। তার বাড়ি যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। তার মনে শুধু স্বপ্ন। সে-দেশে পাখিরা আবার গান ধরবে। ফুলে সৌরভ লাগবে। ঘাস-পাতার সবুজে জাগবে স্নেহশান্তি। মা নতুন শাড়ি পরবেন। বোন পরবে সিল্কের ফ্রক। ছিট কেটে ছোটো ভাইয়ের জন্য প্যাণ্ট হবে। আর সে নিজে ক্যাশমিয়ারের ওপেনব্রেষ্ট গরম কোট পরে চাল দিয়ে বেড়াবে।

সকালে উঠেও অটুট আছে বালিশটা। যেন কত সামান্য খেলো একটা জিনিস—এমনি পড়ে আছে মাদুরের পুঁটুলিতে।

আজ সকালে শেষ প্যাকিং। শুধু বিছানা দুটো বাঁধতে বাকি। একটা খোলা হবে, সেটা হোলড-অলে। আরেকটা শক্ত রশি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

'তোর বিছানাটা আমাদের সঙ্গে দিয়ে দে।' রাজুকে হুকুম করলেন সুধীরবাবু। 'তোর বাক্স আছে থাক, বিছানাটাকে শুধু-শুধু আরেকটা মাল করে লাভ কি?'

সরল মনে বিছানাটা দিয়ে গেলো রাজু। সঙ্গে সেই বালিশ। রাজুর বালিশ খোলা বিছানায় না গিয়ে বদ্ধ বিছানায় বন্দী হলো।

নতুন জায়গায় বদলি হয়ে এলেন সুধীরবাবু।

চাওয়ামাত্রই বাড়ি পাওয়া যায় না আজকাল। অগত্যা ডাক-বাংলোতেই স্থায়ী হলেন।

পেলেন একখানা মাত্র ঘর। চাকরের জন্য আলাদা ঘর নেই। বারান্দায় শোয়ার জায়গা।

রান্নার একটু জায়গা পাওয়া যেতে পারে। উনুন পাতা আছে। জলেরও ব্যবস্থা আছে কাছাকাছি।

আরো কত জিনিসের প্রয়োজন। ভাগ্যিস সঙ্গে চাকর ছিলো।

'তোর বিছানা-বালিশ ভুলে বন্ধ বিছানায় চালান হয়ে গেছে।' বললেন সুরেশ্বরী।

'তাতে কি! আমি শুকনো মেঝের ওপর শোবো।'

'না। এই সুজনিটা নে। আর এই কুশন দুটোকে পাকিয়ে নিয়ে বালিশ কর।'

রাজু যেন তাইতেই রাজ্যেশ্বর! বললে, 'কোনো দরকার ছিলো না, মা।'

'তোর তো আবার উঁচু বালিশে শোবার অভ্যেস। নতুন বালিশ করলি তুলো পুরে—'

একটু কেমন লজ্জিত হবার ভঙ্গি করলো রাজু। বললে, 'তাতে কি! ক-টা দিনই বা! আর দিন কয়েক পরেই তো আমরা কলকাতা যাচ্ছি। তখন শোবো আমার নতুন বালিশে। মনের সুখে আরাম করে নেবো। তারপর দুদিন বাদেই বাড়ি।' চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো রাজুর।

'পূজোর ছুটির পর আবার আসবি না ফিরে?' সুরেশ্বরী যাচাই করবার জন্য প্রশ্ন করলেন।

'না এসে যাবো কোথায়? ও দেশেই যদি থাকবো তবে এখানে এলাম কেন, আপনাদের ঘরে?'

'পূজোর পরেই ভালো বাড়ি পাওয়া যাবে ঠিক হয়েছে।' বৃষ্টিতে বাইরে কোথায় গিয়েছিলো ছাতা মাথায় দিয়ে, ফিরে এসে বললে রঘুনাথ।

'ভালোই হোক, মন্দই হোক, যা তোমাদের, তাই আমার। ছাদ হলে ছাদ, বারান্দা হলে বারান্দা।'

'তুই বড্ড বেশি বকিস রাজু।' ধমকে উঠলো রঘুনাথ : 'নে, আমার ছাতার এই কোণটা সেলাই করে দে দেখি—'

'চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত করছি তো, আর ছাতা সেলাই পারবো না।'

ছাতার বাঁট দিয়ে মাথাটা ঠুকে দিলে রঘুনাথ।

'কেন আর মারছো বলো তো? দুদিন পরেই তো বাড়ি যাবো।'

'আহাহা, তার জন্যে মারবো না! ঠ্যাং ভেঙে দেবো। বাড়ি যাওয়া বার করবো তোমার।'

যেন কত অসম্ভব কথা, এমনিভাবে রাজু হেসে উঠলো।

কলকাতা যাওয়ার মুখে-মুখে জ্বর হলো রাজুর। দুদিনেও জ্বর ছাড়লো না দেখে বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন সুরেশ্বরী।

'দরকার নেই। ওকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।'

'এই অবস্থায় কি করে পাঠানো যায়? ঘোরতর জ্বর।' সুধীর-বাবুর চিন্তিত মুখে প্রচ্ছন্ন রাগের রেখা পড়লো। গলা নামিয়ে বললেন, 'যে করে হোক, ভালো করতে হবে। মারটা বাকি আছে এখনো।'

ভালো ডাক্তার এনে দেখালেন।

বললেন, 'ম্যালেরিয়া। দুদিনেই সেরে যাবে।'

তাই সেরে উঠুক। অন্তত শাস্তিভোগের জন্যেও তো ওর সুস্থ হওয়া দরকার।

কলকাতায় এসেও জ্বর ছাড়লো না রাজুর। পাড়ার সেরা ডাক্তার নিয়ে এলেন সুধীরবাবু। ডাক্তার বললেন, 'সাত দিন না গেলে বোঝা যাবে না।'

কলকাতায় এসেও বন্ধ বিছানাটা খোলা হলো না। সেই বালিশ আর এলো না রাজুর মাথার নীচে। সেই বালিশ যখন নেই, তখন আর ঘুমও নেই। ঘুম যখন নেই তখন আর সেই স্বপ্নও নেই।

এক-একবার ইচ্ছে হয় মাকে ডেকে বলে, 'মা, আমার সেই

বালিশ-বিছানা কই?' কতভাবে বিড়ম্বিত করছে ওঁদেরকে, সামান্য বিষয়েও আর বিব্রত করতে ইচ্ছে হয় না। বন্ধ বিছানা যদি এখনো খোলা না হয়ে থাকে তবে তার জন্য মিছিমিছি কেন এ হাঙ্গামা পোয়ানো?

চুপ করে থাকে রাজু।

পরে হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে—তবে কি ওঁরা টের পেয়েছেন? ধরে ফেলেছেন? জেনে গিয়েছেন সব?

সাত দিনের দিন ডাক্তার এলেন। বললেন, 'কি কষ্ট হচ্ছে?'

রাজু শুধু বললে, 'বালিশের কষ্ট।' এই বালিশটা বড্ড নীচু আর পাতলা।' রাজু বললে জ্বরের ঘোরে।

'তবে আরো উঁচু বালিশ চাই?' সুধীরবাবু হেঁকে উঠলেন।

'হ্যাঁ, বেশ মোটা আর ঠাসা। ভেলা করে যাকে নিয়ে ভেসে যাওয়া যায় ওপারে। আমাদের নদীর চরে। নতুন দেশে।'

তবু নতুন দেখে উঁচু আর মোটা বালিশ এলো, সেই স্বপ্নের বালিশ আর এলো না।

ডাক্তার বললেন, 'টাইফয়েড। কঠিন রকমের!'

সুরেশ্বরী দিশেহারা হয়ে উঠলেন: 'এখন এই দশজনের সংসারে এই বিপদ কে আগলাবে! তখনই বলেছিলাম, জিনিস হাতে এসেছে, এবার ঘাড়ধাক্কা দিয়ে আপদকে বাড়ির বার করে দাও! আমার কথা কানে তুললে না। এখন? আপদকে বিপদ করে ছাড়লে! এখন এই ঠেলা সামলাবে কে?'

'আর কে! হাসপাতাল।' মুখ গম্ভীর করলেন সুধীরবাবু। 'তোমার একার নয়, আমার ইচ্ছাও পূরণ হলো খানিকটা।' বাড়ির বার করে দিলেন সুধীরবাবু ওকে। হাসপাতালে চলে গেলো রাজু।

'কিন্তু একটু যে বাকি থেকে গেলো। হাতের সুখ করে আগা-পাস্তলা মারা হলো না ছোঁড়াকে।'

তবু আকাঙ্ক্ষা থেকে নিস্তার নেই। ইচ্ছা হয়, ও ভালো হোক, ফিরে আসুক, মোটা হোঁক খেয়ে দেয়ে, তারপর মেরে একবার হাতের সুখ করি। ওর বাড়ি যাবার কেরদানিটা একবার দেখি।

সুধীরবাবু হাসপাতালে দেখতে চলেছেন রাজুকে।

'এ কি—তুই এখানে কোত্থেকে ?'

সামনে রঘুনাথ।

'রাজুকে দেখতে এসেছিলাম।'

কিছু বলতে পারলেন না, বকতে পারলেন না সুধীরবাবু। শুধু বললেন, 'কেমন দেখলি ?'

'খুব কষ্ট।'

'কেন ? তোর মাকে দেখতে চায় ?'

'না।'

'তবে কি চায় ?'

'বালিশ চায়।'

'বালিশ ?' থমকে কিছুক্ষণ রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সুধীরবাবু।

'হ্যাঁ, সারাক্ষণই বলছিলো, মাথার বালিশটা ওর বড়ো নীচু, বড়ো পাতলা। হাসপাতাল থেকে কতো বালিশ এনে দিলো ওকে, কিছুতেই ওর মনের মতো হয় না।'

পাড়ার সৎকার-সমিতি রাজুকে সুধীরবাবুদের বাড়ির দরজায় নিয়ে এলো। দেখা গেলো বন্ধ বিছানার দড়ি খুলে রাজুর বালিশটা বার করছে রঘুনাথ।

'এ কি, কি করছিস তুই ?'

'রাজুর বালিশটা বার করছি।'

'বালিশ—এখন আর বালিশ দিয়ে কি হবে ?'

'ওর মাথার নীচে দিয়ে দেবো। বাড়ি যাচ্ছে ও!' রঘুনাথের চোখ জলে আচ্ছন্ন হয়ে এলো : 'বালিশ নিয়ে বাড়ি যাবে এই ওর অনেক দিনের সাধ।'

'সঙ্গে বালিশ একটা দিতে চাস, দে। যেটা তোর খুশি। কিন্তু এটা কেন ? এর মধ্যে কি আছে জানিস ? আমাদের সব শাড়ি-ধুতি জামা-কাপড় চুরি করে-করে ও এই বালিশের মধ্যে রেখেছে।'

'জানি। জানতে আমার আর কিছু বাকি নেই।' কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছে রঘুনাথ : 'সব আমাকে ও বলেছে।'

'বেশ, ওর বালিশই ও নিক সঙ্গে করে, তার বেশি নয়। দাঁড়া, কাপড়-চোপড়গুলো খুলে রাখি। দামী কাপড়চোপড়।'

'না। এ সমস্ত ওর।'

'ওর ? নিজের চোখে দেখ না খুলে। সব চুরি করেছে ও।'

'ও একলাই চোর নয়, বাবা। আমরাও সমান চোর। ও কতকগুলো খুচরো জিনিস চুরি করেছে। আর আমরা ওর গোটা বালিশটাই চুরি করেছি। বালিশটা নিয়ে চোরের মতোই ব্যবহার করেছি আগাগোড়া। ওর জিনিস থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি ওকে।'

গোটা বালিশটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো রঘুনাথ।

কার জিনিস কে কাকে ফিরিয়ে দেয় কে জানে ?

মাথার নীচে বালিশ নিয়ে আরামে ঘুমুতে ঘুমুতে বাড়ি চললো রাজু।

সে আরেক রকম বাড়ি! আরেক রকম ফুল ফোটে সেখানে। ডাকে আরেক রকম পাখি। সেখানে মা আছেন সত্যিকার।